দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

'নাগরিকত্ব' ইস্যু নস্যাৎ হয়ে গেছে অসম নির্বাচনে
— পৃঃ ৬

পশ্চিমবঙ্গ কেবল একটি প্রদেশ নয়, ছ'শো বছরের একটি আস্ত ইতিহাস
— পৃঃ ৮

৭৩ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা।। ২১ জুন, ২০২১।। ৬ আষাঢ় - ১৪২৮।। যুগাব্দ ৫১২৩ ।। website : www.eswastika.com

পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করাই

পশ্চিমবঙ্গ দিবসের শপথ

CHOOSE THE BEST

DURO™

- LIFETIME GUARANTEE FROM INSECT INFESTATION
- TRIPLE HEAT TREATED
- DOUBLE CALIBRATED TECHNOLOGY
- MADE FROM MATURE AND SUSTAINABLE RAW MATERIAL
- LOW EMISSION CONFORMING TO E1 GRADE

The Forest Friendly Company

Duroply Industries Limited

BLOCK BOARD • PLYWOOD • VENEERS • DOORS

113 Park Street, North Block, 4th Floor, Kolkata 700016 | **P:** (033) 2265 2274 | **Toll Free:** 1800 345 3876 (DURO)

Email: corp@duroply.com | **Website:** www.duroply.in | **Find us on** duroplyindia

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ৪০ সংখ্যা, ৬ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

২১ জুন - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

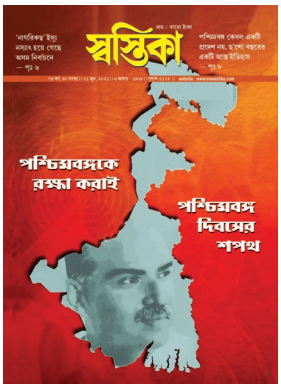

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

'নাগরিকত্ব' ইস্যু নস্যাৎ হয়ে গেছে অসম নির্বাচনে
▯ সুজিত রায় ▯ ৬

পশ্চিমবঙ্গ কেবল একটি প্রদেশের নাম নয়, ছ'শো বছরের একটি আস্ত ইতিহাস ▯ কল্যাণ গৌতম ▯ ৮

পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গ রাখার শপথ গ্রহণের দিন ২০ জুন
▯ প্রকাশ চন্দ্র দাশ ▯ ১২

সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের সুরক্ষা পরিষদের দাবিদার ভারত
▯ ডা: আর এন দাস ▯ ১৪

যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও জাপান জোটের বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে সঙ্গে চায় চীন ▯ ১৭

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা হৃদয়ঙ্গম করেই হিন্দু সমাজকে উঠে দাঁড়াতে হবে ▯ ধর্মপুত্র ▯ ১৯

অষ্টাদশ শতকের এক ব্রিটিশ সন্তান জগতের কাছে ভারতের হিন্দু সভ্যতার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পরিচয় করিয়েছিলেন
▯ দেবাশিস লাহা ▯ ২৩

নাগরিক জীবনে নীরবে বৈপ্লবিক উন্নয়ন
▯ শেখর সেনগুপ্ত ▯ ২৫

With Best Compliments
from :-

A
Well Wisher

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষার ভূমি পশ্চিমবঙ্গ

ইতিহাস বিস্মৃত জাতির তকমা জুটিয়াছে বাঙ্গালি হিন্দুর কপালে। নিজেদের ইতিহাস যাহারা ভুলিয়া যায়, তাহাদের অগ্রগতির পথ সম্পূর্ণ রূপে রুদ্ধ হইয়া যায়। ইতিহাস হইতে শিক্ষা না লইবার কারণে হিন্দু বাঙ্গালিরা আজ তাহাদের সমস্ত কিছু হারাইতে বসিয়াছে। ভারত-সহ সমগ্র বিশ্বে হিন্দু বাঙ্গালির মাথা নীচু হইয়া গিয়াছে। হিন্দু বাঙ্গালির অস্তিত্ব রক্ষার যে ভূমিখণ্ড, যাহা পশ্চিমবঙ্গ নামে পরিচিত, তাহার সৃষ্টি ও স্রষ্টা উভয়কে ভুলিয়াছে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু। স্বাধীনতার এতগুলি বৎসরে রাজ্যে সরকারিভাবে রাজ্যের জন্মদিবস উদ্‌যাপন করা হয় নাই। তাহার স্রষ্টাকে স্মরণ করা হয় নাই। তাহাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় নাই। বরং তাঁহাকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পাঠ্যপুস্তকে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির ইতিহাসকে স্থান দেওয়া হয় নাই। তাই বর্তমান প্রজন্মের মনে প্রশ্ন জাগে না যে, কেন রাজ্যের নাম বঙ্গপ্রদেশ না হইয়া পশ্চিমবঙ্গ হইয়াছে? পূর্ববঙ্গ আলাদা দেশ কেন? ইহাতে তাহাদের কোনো দোষ নাই। কায়েমি স্বার্থান্বেষী ক্ষমতালোভী রাজনীতিকরা এবং তাহাদের ধামাধরা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদরা ইহার জন্য দায়ী। পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুদের মেরুদণ্ডহীনতার তাহারাই আসল কারিগর।

বঙ্গপ্রদেশ ছিল বাঙ্গালি হিন্দুর পুণ্যভূমি। বারবার ইসলামিক আক্রমণ ও শাসনে বঙ্গপ্রদেশের জনবিন্যাসে পরিবর্তন ঘটে। স্বাধীনতার প্রক্কালে সম্পূর্ণ বঙ্গপ্রদেশ পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করিবার পরিকল্পনা করে মুসলিম লিগ। মুসলিম লিগকে সমর্থন করে কমিউনিস্ট পার্টি এবং একজন তপশিলি নেতা। মুসলিম লিগের নেতৃত্বে জেহাদি মুসলমানরা কলকাতা ও নোয়াখালির মাটি হিন্দুর রক্তে লাল করিয়া ফেলে। মুসলিম লিগের জেহাদিদের কবল হইতে হিন্দুদের রক্ষা করিবার জন্য বঙ্গপ্রদেশ ভাঙিয়া তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গের দাবি ওঠে। নেতৃত্ব দেন বঙ্গভূমির সুসন্তান ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ড. আম্বেদকর সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বঙ্গবিভাগের সমর্থন করেন। আটানব্বই শতাংশের বেশি হিন্দু বঙ্গবিভাগের পক্ষে রায় দেন। তাহারই পরিণতিতে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় আইন সভায় পশ্চিমবঙ্গ স্বীকৃতি লাভ করে। বাঙ্গালি হিন্দুরা পায় তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষার ভূমি।

অতীব দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা এই ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছে। পুনরায় দেশবিভাগের সময়কার পরিবেশ ও পরিস্থিতি উৎপন্ন হইয়াছে। শুধুমাত্র ভোটের রাজনীতি করিবার ফলে জেহাদি শক্তির বাড়বাড়ন্ত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ করিবার হুংকার শোনা যাইতেছে। বিধানসভা নির্বাচনের পর বর্তমান শাসকদলের আশ্রিত জেহাদিরা গ্রামবাঙ্গলায় নিরন্তর তাণ্ডব চালাইতেছে। রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসন নীরব। তাই আজ পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গ রাখিবার শপথ করিতে হইবে। ২০ জুন সেই পথ গ্রহণ করিবার দিন। এই দিনের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিলেই বাঙ্গালি হিন্দু আত্মবিস্মৃত জাতির তকমা ছুড়িয়া ফেলিয়া স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারিবে।

সুভাষিতম্

দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বশাটপটাবৃতঃ।

তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে।।

ধোপদুরস্ত পট্টবস্ত্রাদি পরিহিত মূর্খ ব্যক্তিকে দূর থেকেই ভালো দেখায়। ততক্ষণই তাকে সুন্দর লাগে যতক্ষণ সে কথা না বলে।

‘নাগরিকত্ব’ ইস্যু নস্যাৎ হয়ে গেছে অসম নির্বাচনে

সুজিত রায়

বিভিন্ন পণ্ডিতপ্রবর নির্বাচনী বিশ্লেষকরা পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ফলাফলকে কেন্দ্রীয় সরকারের নাগরিকত্ব আইনের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধাচরণের ফল হিসেবে তুলে ধরছেন। তাঁরা একথাও বলেছেন গলা ফাটিয়ে যে, পশ্চিমবঙ্গের ২০২১-এর ভোটের ফল নির্মমভাবে প্রমাণ করেছে, বিজেপি হিন্দুধর্মের প্রতি একদেশদর্শিতা এবং মুসলমান জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্তকে সার্বিকভাবে মানুষ প্রত্যাখান করেছেন। মুসলমান ভোটের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মের ভোটারদের মেরুকরণ করার যে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা বিজেপি এবং ভারত সরকার নিয়েছিল, হিন্দু ভোটাররাও তার বিরোধিতা করেছে বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে।

ভোট-পণ্ডিতদের এই বিশ্লেষণ যে নিতান্তই একটা মনগড়া ন্যারেটিভ, তা পরিস্ফুট হয়ে যায়, যখন দেখা যায়, বিজেপি রাজ্যের ৩৭ শতাংশ মানুষের ভোট ধরে রেখেছে এবং শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের হাজারো নেতিবাচক রাজনীতি, সংখ্যালঘুদের ধ্বংসাত্মক রাজনীতি এবং কংগ্রেস ও বামপন্থীদের সম্মিলিত বিজেপি বিরোধিতার ঝড় ঠেলেও বিজেপির আসন সংখ্যা ২০১৬-র তিন থেকে সাতাত্তরে পৌঁছেছে এবং প্রায় আরও ৮০টি আসনে বিজেপির পরাজয় হয় যৎসামান্য ভোটে।

অর্থাৎ ভোটে একথা কোনোভাবেই প্রমাণিত হয়নি যে, রাজ্যের সব মানুষ নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করেছে বা হিন্দুত্বের অবমাননা করেছে। অবশ্য নিঃসন্দেহে একথা প্রমাণিত হয়েছে, মুসলমান ভোটের মেরুকরণ ঘটিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। কারণ এই মুসলমান ভোটারদের একটা বড়ো অংশ অনুপ্রবেশকারী এবং রাজ্যের বেআইনি বাসিন্দা। ভোটের অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে তারা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়ে ঘাপটি মেরে বসেছিল। সময়মতো তারা ফোঁস করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। ভোট-পণ্ডিতরা কিন্তু একথা বলতে পারছেন না শাসকদলের ভয়ে।

সাধারণ জীবন যাপন, মানুষের সঙ্গে সহজ সরলভাবে মেলামেশা এবং মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া তা দেখেই বিজেপি তাঁর দলের সঙ্গে জোট তৈরি করে নির্বাচনে গিয়েছিল। মানুষ সেই জোটকে আশীর্বাদ করেছে। দক্ষিণী রাজ্যে উড়েছে বিজেপির বিজয় পতাকা।

ভোট-পণ্ডিতরা তাঁদের যুক্তি ভ্রান্ত বলে মানতে বাধ্য হবেন, যদি প্রতিবেশী রাজ্য অসমের ফলাফল বিশ্লেষণ করেন। অসমে এবার দ্বিতীয়বার রাজ্যের প্রশাসনে বসল বিজেপি রাজ্য বিধানসভার ১২৬টি আসনের ৭৫টি আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক অ্যালায়েন্স। বিপরীতে ছিল কংগ্রেস-সহ আট রাজনৈতিক দলের মহাজোট। তারা সম্মিলিতভাবে ধরে রাখতে পেরেছে ৫০টি আসন। মোট ২,৩৩,৭৪,০৮৭ ভোটারের ৮২.০৪ শতাংশ চূড়ান্ত মতদাতার ৩৩.২ শতাংশ ভোটই পেয়েছে বিজেপি। প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস পেয়েছে ২৯.৭ ভোট এবং ২৯টি আসন।

ভোট-পণ্ডিতদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বিজেপির এই ফলাফল পূর্ববর্তী বিধানসভা নির্বাচনের মতো চমকপ্রদ না হলেও ভোট- পণ্ডিতদের কাছে যথেষ্ট হতাশাব্যঞ্জক। কারণ তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন, শুধুমাত্র নাগরিকত্ব ইস্যুতেই এবার অসমে তলিয়ে যাবে বিজেপি। কারণ, নিঃসন্দেহে, নাগরিকত্ব আইন এবং তার প্রাথমিক প্রয়োগ নিয়ে দেশজুড়ে নিন্দিত হয়েছে অসমের রাজ্য প্রশাসন। বেশ কিছু সত্য ঘটনা তুলে ধরে নাগরিকত্ব আইন প্রয়োগের বিসম পরিণতি যেমন উঠে এসেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ছড়ানো হয়েছে গুজব, মিথ্যাচার আর বানানো তথ্য। এই মিথ্যাচার প্রচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল কংগ্রেস

এবং প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ও সর্বোপরি দলের একমাত্র নেতা (নেত্রী) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মিথ্যাচার কালক্রমে প্রমাণ করে দিয়েছে, মিথ্যা তথ্য ও গুজব প্রচারে তিনি এবং তাঁর দল এবার অসমে সমস্ত শালীনতা অতিক্রম করেছিলেন, মানবতা তো বটেই। প্রমাণ করেছিলেন, গোয়েবলসের প্রকৃত শিষ্যা তিনি। ভেবেছিলেন, ওই অঙ্কেই মাথা গলাবেন অসমে। পাত্তা পাননি। অসমের ভোটাররা শুধু তাঁকেই নস্যাৎ করেননি, নেতিবাচক রাজনীতির জন্য ছুঁড়ে ফেলেছেন সমস্ত বিরোধী শক্তিকে। বিরোধী শক্তিগুলি হিন্দু ভোটের মেরুকরণের প্রসঙ্গ তুলে জিগির তুলেছিলেন কয়েকটি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে মদত দিয়ে রাজ্যে বিজেপির বিরুদ্ধাচারণ করতে। তাদের সে চেষ্টার মুখেও কালি ছিঁটিয়ে দিয়ে ভোটাররা প্রমাণ করেছেন, ভোট বিশ্লেষকরা নাগরিকত্ব আইনের স্বরূপটাকেই চেনেননি। ভুল ব্যাখ্যা করেছেন হিন্দুত্ব এবং হিন্দু ভোট মেরুকরণের। নাগরিকত্ব আইনের পক্ষে ভোট যেমন জনগণের ভোট, হিন্দুত্বের পক্ষের ভোটটাও আসলে সংখ্যালঘু জনগণের ভোট। এই সহজ সত্যটাকে না মেনে উপায় কী!

অসম বিধানসভার ফলাফল আরও একটা কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো, এই ফলাফল নাগরিকত্ব আইন এবং নাগরিক পঞ্জীকরণের প্রয়োগ পশ্চিমবঙ্গ-সহ অন্যান্য রাজ্যে করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা নেবে। প্রমাণ করবে, সামগ্রিক ভাবে মুসলমান জনসমাজ নয়, আইনকে ভয় পাবেন শুধুমাত্র অনুপ্রবেশকারীরাই। ভোটের প্রচারে ঠিক এই বিষয়টিকেই তুলে ধরেছিলেন বিজেপি নেতৃত্ব। তাঁরা বলেছিলেন, এবারের ভোটযুদ্ধ আসলে অসমের নিজস্ব জনগণ বনাম মুঘলদের মতো হানাদারদের যুদ্ধ। মানুষ রায় দিয়েছে হানাদারদের বিরুদ্ধেই। অদূর ভবিষ্যতে অসমের ফলাফল উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কেন্দ্রের লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

কেরল বিধানসভার নির্বাচনে ২০১৬-র মতো এবারেরও বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টই জয়লাভ করে ক্ষমতায় এসেছে। ২০১৬-য় এলডিএফ পেয়েছিল ৯১টি আসন। এবার পেয়েছে ৯৭টি। বিজেপি তাদের জেতা একটিমাত্র আসনও এবার নির্বাচনে ধরে রাখতে পারেনি। দল পুরোপুরি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কুম্মানম রাজশেখরণ, কে সুন্দরণ, শোভা সুন্দরণ এবং ই সুরেন্দ্রণের মতো বিজেপি নেতারাও এবার হালে পানি পাননি। প্রধান বিরোধী শক্তি ইউনাইটেড ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট জিতেছে ৪১টি আসনে। পি বিজয়নের নেতৃত্বাধীন বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এবারও ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছে মূলত দুটি ইস্যুতে। প্রথমত ২০১৮ সালের তীব্র বন্যায় সরকারের ভূমিকা এবং করোনা অতিমারীর নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত সময়োচিত বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ। গোটা বিশ্বই কেরলের এই দুটি পদক্ষেপকে ভোটের অনেক আগেই স্যালুট জানিয়েছিল।

কেরলের ভোটে বিজেপির পরাজয়ের মূলে অন্যতম কারণ শবরীমালা মন্দিরে রজস্বলা মহিলাদের প্রবেশে অনুমতি না দেওয়ার জন্য যে চিরন্তন নীতি, তাকে সমর্থন করা। দলগতভাবে না হলেও, বিজেপি নেতৃত্বের একাংশ মুসলমান অধ্যুষিত কেরলে হিন্দু ভোটের সমর্থন পেতে এই ইস্যুটিকে সমর্থন জানিয়েছিল। আধুনিক যুগের হিন্দুরা এই সমর্থনকে সমর্থন জানাতে চায়নি বিশেষ করে এমন একটা সময়ে যখন সুপ্রিম কোর্ট ও শবরীমালা মন্দিরে যুগযুগান্ত ধরে চলে আসা রীতিকে মান্যতা দেননি। একই সঙ্গে নাগরিকত্ব আইন এবং নাগরিক পঞ্জীকরণের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের একটানা প্রচারও বিজেপি বিরোধী ভোটকে সংগঠিত করেছে।

এবারের পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে সবচেয়ে মনোগ্রাহী লড়াইটা হয়েছে তামিলনাড়ুতে। তামিলনাড়ু মানেই ডিএমকে এবং আইএডিএমকে লড়াই। তামিলনাড়ু মানেই কে করুণানিধি আর জয়ললিতার লড়াই। এবার নির্বাচনে এই দুই অবিসংবাদী এবং বিতর্কিত নেতা/নেত্রী ছিলেন না। কারণ তাঁরা প্রয়াত। লড়াইটি ছিল করুণানিধির সন্তান স্ট্যালিন এবং অ্যাক্সিডেন্টাল চিফ মিনিস্টার ই কে পালানিস্বামীর। দলের মধ্যে তীব্র শত্রুতা এবং রাজনীতির ময়দানে প্রায় বিসমমনস্ক বিজেপিকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনে জিততে পারেননি ঠিকই কিন্তু ২৩৪ আসনে ৭৫টিতে হইহই করে জিতেছে তাঁর নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট। পালানিস্বামী নিজেও জিতেছেন অবিশ্বাস্য ৯৩,৮০২ ভোটে এবং প্রমাণ করেছেন, তিনি ঘটনাচক্রে মুখ্যমন্ত্রী হলেও, তাঁর উত্থানটা ঘটনাচক্রে নয়। পালানিস্বামীর এই জয় বিজেপির পক্ষেও ইতিবাচক, কারণ বিরোধী আসনে বসে বিজেপির যাত্রাপথ পরবর্তী উত্থানের পথ চিনিয়ে দেবে।

৩০ আসনবিশিষ্ট পুদুচেরী বিধানসভায় এবারের লড়াই ছিল মূলত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ-র মধ্যে। প্রত্যাশামতোই এবারের নির্বাচনের বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ ১৬ আসনে জয়লাভ করে শাসনক্ষমতা ধরে রেখেছে। ভোট পেয়েছে ৫৩.৩৩ শতাংশ। অন্যদিকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ পেয়েছে ৯টি আসন। ভোট মিলেছে মাত্র ৩০ শতাংশ। অবশ্য সামগ্রিকভাবে এই জয় মূলত 'জনতার মুখ্যমন্ত্রী' এআইএনআসসি নেতা এন রঙ্গস্বামীর জয়। তাঁর সাধারণ জীবন যাপন, মানুষের সঙ্গে সহজ সরলভাবে মেলামেশা এবং মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া তা দেখেই বিজেপি তাঁর দলের সঙ্গে জোট তৈরি করে নির্বাচনে গিয়েছিল। মানুষ সেই জোটকে আশীর্বাদ করেছে। দক্ষিণী রাজ্যে উড়েছে বিজেপির বিজয় পতাকা। ☐

পশ্চিমবঙ্গ কেবল একটি প্রদেশের নাম নয়, ছ'শো বছরের একটি আস্ত ইতিহাস

কল্যাণ গৌতম

২০ জুন, পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠা দিবস। বাঙ্গালি হিন্দুর বিজয় দিবস। একটি রথযাত্রার দিন, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তার মহান সারথি। তিনি পশ্চিমবঙ্গের রথ ছুটিয়ে নিয়ে দিল্লিতে চলেছেন। বাঙ্গলা মা ভারত মাতায় একাকার হবে। পশ্চিমবঙ্গ কেবল একটি প্রদেশের নাম নয়, কেবল পূর্বতন বঙ্গপ্রদেশের পশ্চিমাংশ নয়। পশ্চিমবঙ্গ একটি ভাবনার নাম, পশ্চিমবঙ্গ বাঙ্গালির অস্তিত্বের নাম, পশ্চিমবঙ্গ বাঙ্গালির অস্মিতার নাম, পশ্চিমবঙ্গ এক অবর্ণনীয় ইতিহাসের নাম। মানুষ যখন প্রশ্ন করবে, 'পশ্চিমবঙ্গ' যখন আছে, পূর্ব নিশ্চয়ই ছিল, তা কোথায় গেল? যে বাঙ্গালি স্বাধীনতা আন্দোলনে এত বলিদান দিয়েছে, যে বাঙ্গালি এত ত্যাগ স্বীকার করেছে, নবজাগরণে পথ দেখিয়েছে তারই উত্তরাধিকারের নাম পশ্চিমবঙ্গ।

প্রশ্ন আসবে বাঙ্গালি কারা? বাংলাভাষায় কথা বললেই কেউ বাঙ্গালি হয়ে যান না। ইংরেজি ভাষায় কথা বললেই কেউ ইংরেজ হয়ে যান? জার্মান ভাষায় কথা বললেই জার্মান হয়ে ওঠেন? বাংলা ভাষায় কথা বললেও তিনি বাঙ্গালি হবেন না। বাঙ্গালি হতে হলে বাঙ্গলার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নিয়ে চলতে হয়। এই উত্তরাধিকার কয়েক হাজার বছরের পারম্পর্য। এই ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেব আছেন, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন, আছেন বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ, শ্রীঅরবিন্দের মতো মনীষীরা। এই উত্তরাধিকারে দুর্গাপূজা আছে, দোল, জন্মাষ্টমী, গাজন, মনসাপূজা, রামনবমী আছে। এই সামগ্রিকতা যারা ভুলিয়ে দিতে চান, তারা বাংলা ভাষায় কথা বললেও বাঙ্গালি পদবাচ্য নন। যারা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত অহরহ বিদেশি শব্দভাণ্ডার সঙ্গী করে কথা কন, তাদের ভাষা কী বাংলা?

শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন অখণ্ড ভারতের সাধক, তাই অখণ্ড বঙ্গেরও বীজমন্ত্র তিনি জপ করতেন। শ্যামাপ্রসাদের যুক্তি ছিল মুসলমান- গরিষ্ঠ প্রদেশগুলি হিন্দুপ্রধান ভারতে না থাকতে পারে তবে হিন্দুপ্রধান জেলাগুলিই-বা ইসলামি পাকিস্তানে যাবে কেন? যে নীতিতে ভারত ভাগ হচ্ছে সেই একই নীতি মেনে পাকিস্তানকেও ভাগ করতে হবে।

সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে যে বাঙ্গালি দেশের পথ দেখিয়েছে তাকে নিমেষে ইসলামি দেশ করে ফেলার চক্রান্ত হলো। এর বিরোধিতা করার ইতিহাস থেকেই পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হলো। আন্দোলনের নেতৃত্বে এগিয়ে এলেন হিন্দু-অস্মিতার নয়নের মণি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। স্যার আশুতোষ মুখার্জির সুপুত্র; একাধারে শিক্ষাবিদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, আদ্যন্ত সেবাব্রতী, নিঃস্বার্থ এক মানুষ। রাজনীতির বাইরেও তাঁর অনবদ্য ভূমিকা। অথচ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর জন্মদিনে একটি মালাও জোটে না! আজ এই বিশেষ দিনে আলোচনা করছি পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়ার কথা, তাৎপর্যের কথা। আলোচনার পরতে পরতে শ্যামাপ্রসাদের নাম আসবে।

পশ্চিমবঙ্গ দিবসের তাৎপর্য কী? তাৎপর্য হলো নির্যাতিত বাঙ্গালি হিন্দুদের জন্য একটি হোমল্যান্ড আদায় করার রোমহর্ষক কাহিনি। কে তার কারিগর? ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। কেন বঙ্গপ্রদেশকে ভাগ করতে হলো? উত্তর পাওয়া যাবে ভাগ করার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করে। আর তখনই পশ্চিমবঙ্গ দিবসের তাৎপর্য আমরা খুঁজে পাবো।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এই পর্বে সার্বিক নেতৃত্ব দিলেন। তখন বাঙ্গলার ইতিহাসে তেমন বড়ো মাপের নেতা নেই। দেশ ত্যাগ করে নেতাজী বাইরে গিয়ে লড়াই করার মাঝে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন, আমরা জানি না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরলোকগমন করেছেন আগেই। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীর সাধন মার্গে বিরাজ করছেন। ১৯৪৭ সালে

২০ জুন হিন্দু বিধায়করা বাঙ্গলা ভাগ করে 'পশ্চিমবঙ্গ' গঠনের জন্য ইতিহাস গড়লেন। বিভক্ত ভারতের মধ্যে থেকেই হিন্দু বাঙ্গালির আলাদা বাসভূমি রচনার জন্য নির্বাচনে অংশ নেওয়া। যারা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ভোট দিলেন, হিংস্র মানুষেব ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেও অনড় থাকলেন তারা বীরসাধক। যার তৈরি পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দখলদারি বজায় রাখতে নানান কৌশল অনলম্বল করলেন তারা ক্ষীর-খাদক। ক্ষীর-খাদকের সংজ্ঞা-স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য দেবার দিন হলো ২০ জুন, পশ্চিমবঙ্গ দিবস।

পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি না হলে এই ভূখণ্ড পাকিস্তানে যুক্ত হতো অথবা যুক্তবঙ্গে যেত। অতি অবশ্যই পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে চলে যেত, নতুবা আলাদা একটি মুসলমান কান্ট্রি হতো। আপনারা জানেন স্বাধীন বাংলাদেশের কী পরিণতি হয়েছে। স্বাধীনতা পাবার কয়েক বছরের মধ্যে ইসলামিক দেশ হয়ে গেছে। বাঙ্গলা মুসলমান সংখ্যাধিক্যে স্বাধীন দেশ হলে জিন্না-সুরাবর্দি প্রমুখ নেতাদের ইচ্ছেয় 'সাবসিডিয়ারি পাকিস্তান' হতো। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি একেই বলেছিলেন 'ভার্চুয়াল পাকিস্তান'। তিনি এই ভূখণ্ডটিকে কোনোমতেই পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করতে দেননি।

স্বাধীন বঙ্গের নামে 'বোরখাবৃত পাকিস্তান' হবার পথেও বাধা দিয়েছিলেন তিনি। জিন্না যখন বুঝলেন কলকাতা সমেত কিছুতেই পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না, তখন বঙ্গের মুসলমান নেতাদের দিয়ে ইংরেজ গভর্নরের পরামর্শে যুক্ত ও স্বাধীন বাঙ্গলার নামে ভারত থেকে কেটে দিতে চাইলেন। অনেক চেষ্টা হলো, সে এক দীর্ঘ টানাপেড়েনের ইতিহাস। কুচক্রীদের মধ্যে কিছু রাজনৈতিক দল ছিল, তাদের সঙ্গে আমাদের মোলাকাতও হয়েছে, তাদের উত্তরাধিকারীদেরও আমরা চিনি। কিছু সুযোগসন্ধানী হিন্দু নেতাও ছিলেন। ভালোভাবে এদের চিনে নেবার দিনটি হলো ২০ জুন পালনের তাৎপর্য।

পশ্চিমবঙ্গ পাকিস্তানে গেলে বা স্বাধীন বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হলে অত্যাচারিত বাঙ্গালি হিন্দুর কোথাও স্থান হতো না, হয়তো প্রত্ন-ইতিহাসে হিন্দু বাঙ্গালির স্থান হতো। এখনও কলকাতায় বসে, রাজ্যের সুরক্ষিত শহরে বসে যে হিন্দু-বাবু-সম্প্রদায় তোষণের চাদর গায়ে দিয়ে শ্যামাপ্রসাদের অহরহ মুণ্ডপাত করেন, তা তাঁরই করে দেওয়া ভূমির উপর। এদের সামনে সত্যের সত্তা লজ্জিত হয়। এদের মনগড়া ইতিহাস পড়তে হয়। এই ইতিহাস এতদিন বাঙ্গালি মানতে বাধ্য হয়েছে, মনে হচ্ছে আগামীদিনে আর মানবে না। বাংলায় প্রবাদ আছে, 'যে পাতে খায়, সে পাতেই থুকায়'। ভাবুন কতখানি অকৃতজ্ঞ হলে মানুষ এটা করতে পারে! বাঙ্গালি হিন্দুর নির্যাতনের ধারাবাহিক যারা ভুলিয়ে দিয়েছে তারা কী ধাতুতে গড়া!

এককথায় বলা যায়— 'খায় দায় পাখিটি, বনের দিকে আঁখিটি।' এদের সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদ নিজেই মন্তব্য করেছিলেন— 'নিজেদের একটু ভারতীয় বলে ভাবুন, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

এ রাজ্যের কয়েকটি রাজনৈতিক দল স্লোগান দেয়, 'বাঙ্গলা ভাগ করল কে? শ্যামাপ্রসাদ আবার কে?' কিন্তু ওদের দ্বারাই তো 'নেপোয় মারে দই' হয়েছে! ওদের বড়ো বড়ো নেতাই তো পূর্ব পাকিস্তানে থাকা নিরাপদ মনে করেননি। কোটি কোটি অসহায় হিন্দুকে ওদেশে ফেলে চলে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ভূখণ্ডে। সেই বাঙ্গালি হিন্দু সামনা করলো লোলুপ নেকড়েদের। অত্যাচারে, অগ্নি সংযোগে, ধর্ষণে, প্রিয়জনের মৃত্যুতে দলে দলে হিন্দু পালিয়ে আসতে বাধ্য হলো এপার বাঙ্গলায়। ২২ শতাংশ থেকে হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে দাঁড়ালো ৮.৫ শতাংশ। নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গের ওই নেতারা ওত পেতে বসে রইলেন, সীমান্ত ডিঙোনো ভিটেমাটি হারানো উদ্বাস্তুদের একে একে ধরার জন্য। তাদের কাঁধে ভর দিয়ে রাইটার্স বিল্ডিং দখল হলো। কয়েক দশক ধরে বাঙ্গলার সংস্কৃতিকে একেবারে পালটে দিল তাদের কনসার্ট। শ্যামাপ্রসাদকে ভুলিয়ে দিলেন, তাঁকে 'সাম্পদায়িক' আখ্যা দিলেন। আপনাদের ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে কবি নজরুল ইসলামকে চিকিৎসার যাবতীয় সহায়তা করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। নজরুল কিন্তু তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলে মনে করেননি, তাই তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। চিকিৎসার খরচ জুগিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য নিজের প্রবাস গৃহে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে। বাঙ্গলায় যে সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ, সেই ফজলুল হকও তাঁকে সাম্প্রদায়িক মনে করতেন না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন তিনি ইসলামি ইতিহাস ও সংস্কৃতির উচ্চতর পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করেছিলেন। মুসলমান ছাত্রদের নানাভাবে সহায়তা করতেন যিনি, তাঁকেই ওরা সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিলেন। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, 'পাপ করেছো রাশিরাশি। ভুগবে কী তোমার মাসিপিসি?' মানুষ যত সত্য ইতিহাস জানছে, মানুষের থেকে ওরা ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

দেশ ভাগ হলো। দেশ ভাগের সমর্থক ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। 'Jinnah got Pakistan, but it was one he called 'moth-eaten' because he lost East Punjab and West Bengal.' পোকাকাটা পাকিস্তান জিন্নাকে উপহার দেবার কৃতিত্ব শ্যামাপ্রসাদের। বলা হয়, 'He was successful in mobilizing the Hindu community fo division, Sarat Bose and his allies could not resist.' নেতাজীর দাদা শরৎ চন্দ্র বসু, কংগ্রেসের কিরণ শঙ্কর রায়, মুসলিম লিগের সুরাবর্দি প্রমুখর সঙ্গে বাঙ্গলার গভর্নর বারোজের ইচ্ছাও জলে গেল। ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের ইচ্ছেকেও সুকৌশলে পিছনে ফেলে দিলেন শ্যামাপ্রসাদ। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান খণ্ডটিকে ভারতে ধরে রাখার রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও জনসমক্ষের আন্দোলনে শ্যামাপ্রসাদ জিতলেন। তাই সংসদে তিনি নেহরুর মুখের উপর শুনিয়ে দিতে পেরেছিলেন 'You divided India, I divided Pakistan.'

'শ্যামাজননীর মহাপ্রসাদ শামাপ্রসাদ'। কবিশেখর কালিদাস রায় কবিতাতে এই মন্তব্য করেছিলেন। বাঙ্গলাতে শ্যামাপ্রসাদের আবির্ভাব মহাকালীর প্রলয় নৃত্যের মতো। হিন্দু বাঙ্গালিকে বাঁচানোর

জন্য, সারা দেশে 'এক বিধান, এক নিশান, এক প্রধান' করবার নেতৃত্ব দিয়ে খেসারত দিলেন তিনি। জীবন বলিদান দিলেন। মনে পড়বে স্বামী বিবেকানন্দের কবিতা 'Kali the Mother' কবিতাটি :

'যে দেয় দুঃখে প্রেম
মৃত্যুকে ধরে বক্ষে
প্রলয় নৃত্যে মত্ত
মা-যে আসে তারই চিত্তে।"

২০ জুন বঙ্গবাসীকে এ কথা বারবার মনে করানোর জন্য আসে।

শরৎ-কিরণ-সুরাবর্দির 'ভার্চুয়াল পাকিস্তান'

ভোকাট্টা করে আনলে ছিনে মুখার্জির ওই গান।

যুক্ত-স্বাধীন বাঙ্গলার নামে যাবতীয় শয়তানি

বিশে জুন তার সামূহিক বিষ ভাঙ্গিয়া দিল আনি। পশ্চিমবঙ্গ একটি আশার নাম, পশ্চিমবঙ্গ একটি আশ্রয়ের নাম। এই বাঙ্গলার রূপেই আছে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। এটাই বিশুদ্ধ বাঙ্গলা।

আসুন, এক ঝলকে দেখে নিই সে সময় বাঙ্গলার পরিস্থিতি কেমন ছিল? কেন ভাগ করতেই হলো? ৬০০ বছরের বাঙ্গলায় ইসলামি শাসনের ইতিহাস বাঙ্গালি ভোলেনি। সেই ছ'শো বছরে ধ্বংস হয়েছে বাঙ্গলার হিন্দু বৌদ্ধ প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মন্দির ও প্রতিষ্ঠান। মাঝে ইংরেজ রাজত্বের ২০০ বছরে অনেকটা শান্তির পর ১৯৩৭ সাল থেকে মুসলিম লিগের শাসন, ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট শুরু হওয়া কলকাতার বীভৎস দাঙ্গা, তারপর নোয়াখালিতে হিন্দু গণহত্যার পর অখণ্ড ভারতের প্রবক্তা শ্যামাপ্রসাদ বলতে বাধ্য হলেন, ভারত ভাগ হোক বা না হোক, বাঙ্গলাকে খণ্ডিত করতেই হবে, তা না হলে বাঙ্গালি-হিন্দু- সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। ১৯৪৭ সালের মার্চ মসে অমৃতবাজার পত্রিকা গ্যালপ পোলের রেজাল্ট প্রকাশ করেছিল, সেখানে দেখা গেল ৯৮.৩ শতাংশ বাঙ্গালি-হিন্দু সেই সময় বঙ্গবিভাগ সমর্থন করছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে জানানো হয়, প্রদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে যে ১০৬টি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে তার মাত্র ৬টিতে বাঙ্গলা ভাগের বিরোধিতা করা হয়েছে। এই ভাবনায় সঙ্গী হয়েছিলেন বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীদের একাংশ। ১৯৪৭ সালের ২২ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জনসভায় শ্যামাপ্রসাদকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখলেন ঐতিহাসিক ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন। সেই বছর ৭ মে একটি তারবার্তা সরকারের কাছে পাঠালেন শিক্ষাবিদদের একটি দল, তাতে শামিল হলেন ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, ড. শিশির মিত্র, ভাষাচার্য ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা লিখলেন, বাংলাদেশে একটানা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে এবং শিক্ষা, ব্যবসা ও শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। নানান সভায় ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাজনৈতিক নেতা বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ বঙ্গবিভাগের সমর্থনে কথা বললেন।

শ্যামাপ্রসাদের যুক্তি ছিল মুসলমান-গরিষ্ঠ প্রদেশগুলি হিন্দুপ্রধান ভারতে না থাকতে পারে তবে হিন্দুপ্রধান জেলাগুলিই-বা ইসলামি পাকিস্তানে যাবে কেন? যে নীতিতে ভারত ভাগ হচ্ছে সেই একই নীতি মেনে পাকিস্তানকেও ভাগ করতে হবে। ভারতের সংলগ্ন হিন্দুপ্রধান জেলাগুলিকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

হালে পানি না পেয়ে অখণ্ড বঙ্গের সমর্থকরা স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গদেশ গঠনের ডাক দিলেন। যৌথডাক এলো মুসলিম লিগ নেতা সুরাবর্দি এবং নেতাজীর দাদা শরৎচন্দ্র বসু। কিন্তু এই ফাঁদে বাঙ্গালি হিন্দু পা দেয়নি। কারণ সুরাবর্দির জিঘাংসক ব্যক্তিত্ব তখনও হিন্দুদের কাছে তরতাজা, অমলিন। শরৎ বসু একলা ডাক দিলে কী হতো, বলা যায় না, বাঙ্গালি হিন্দু ভুল করলেও করতে পারতো।

পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করে ইতিহাস ভুলিয়ে দেবার চক্রান্ত ইদানীংকালেও চলেছে। ২০১৬ সালের ২৯ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এক বিশেষ অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়কদের ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের নতুন নাম হবে 'বাংলা', হিন্দিতে 'বঙ্গাল' বা ইংরেজিতে 'বেঙ্গল'। সিপিএমের এই পরিবর্তনে আপত্তি ছিল না, কারণ এর আগে জ্যোতি বসুর আমলে তারাই ইতিহাস ভুলিয়ে দেবার এই প্রস্তাব এনেছিল। ২০১৮ সালের ১৫ জুলাই সব ভাষাতেই 'বাংলা' নাম হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রস্তাব বিধানসভায় গৃহীত হয়। যুক্তি ছিল West Bengal নাম থাকলে কেন্দ্রীয় আলোচনায় ইংরেজি বর্ণানুক্রমিকের শেষে সুযোগ পায় পশ্চিমবঙ্গ। অসুবিধা কাটাতে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল' নামটি বাদ যাক, 'বাংলা' করা হলে 'B'-এর কারণে দৌড়ে এগিয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ আবেদন করতেই পারতো, কেন্দ্রীয় আলোচনায় একবার শুরু হবে 'A' থেকে, পরের বার 'B' থেকে। তাহলে তো ইংরেজি বর্ণানুক্রমে কোনো বৈষম্য থাকে না। আসলে তাদের উদ্দেশ্য সৎ ছিল না, ইতিহাস ভোলানোই ছিল কাজ। আলোচনা তো এমন ভাবেও হতে পারতো, রাজ্যের নামগুলি কম্পিউটারে Random পদ্ধতিতে ঠিক হবে। নাম পাল্টিয়ে 'Paschimbanga' করা যেতে পারতো, তা কিন্তু হলো না, অন্য মোটিভ কাজ করছিল। লাখো মানুষের আপত্তিতে এ দূরভিসন্ধি বাস্তবায়ন হয়নি। কিন্তু এটার মধ্যে সততা ছিল না, মানুষ পরিষ্কার বুঝতে পেরে গেছিল।

এ প্রসঙ্গে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনার কথা উল্লেখ করে আলোচনা শেষ করবো। ২০০০ সালের জুলাই মাসে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বাঙ্গালি অধ্যাপক, যিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে পরে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে সাংসদ হয়ে দিল্লি গিয়েছিলেন, বললেন, 'বঙ্গভঙ্গের প্রবক্তাকে যদি আমরা বাঙ্গালি নায়ক বা পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা হিসাবে মানতে চাই, তাহলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নয়, লাটসাহেব কার্জনকেই আমাদের পুজোর বেদিতে বসিয়ে আরাধনা করা উচিত।' শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে একজন ইতিহাসের অধ্যাপকের এহেন মন্তব্য খুবই কুরুচিপূর্ণ!

স্বদেশি জাগরণ তথা স্বাবলম্বী ভারত

গঠনের বর্তমান কালপর্বে দাঁড়িয়ে নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দিতে হবে না, ১৯০৫ এবং ১৯৪৭ সালের প্রেক্ষাপট কী ছিল! বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল ব্রিটিশদের দ্বারা হিন্দু-মুসলমান বিভেদ সৃষ্টির জন্য। আর স্বাধীনতার বছরে বঙ্গবিভাগ হয়েছিল মুসলমান আগ্রাসকদের দ্বারা হিন্দুর মান-ইজ্জত ও সম্পত্তি রক্ষার গুরুতর অভিযোগের চিরস্থায়ী সুরাহা করতে। যে ব্যক্তি বাঁদর আর শিবের প্রভেদ বোঝেন না, তাঁকে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই মানায় না, অথচ বিনা প্রশ্নে তিনি সংসদে চলে গেলেন। তাঁরই পূর্বজ শরৎচন্দ্র বসুর অপ্রাপ্তি কি তাকে এই মন্তব্য করতে প্ররোচিত করেছে! না-কি আরও গভীরতম অস্পষ্টতা আছে?

শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন অখণ্ড ভারতের সাধক, তাই অখণ্ড বঙ্গেরও বীজমন্ত্র তিনি জপ করতেন। বঙ্গবিভাগ নিয়ে তখন আলোচনা আন্দোলন চলছে। হিন্দু মহাসভার কয়েকজন যুবকর্মী শ্যামাপ্রসাদের কাছে এলেন। বললেন, দেশ তো বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার আন্দোলনের মাধ্যমে উদ্দীপিত হয়েছে। আজ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করলে সেটা কী স্ববিরোধী হবে না? শ্যামাপ্রসাদ উত্তর দিলেন, 'এই সেন্টিমেন্ট আমার ছিল। কিন্তু সেন্টিমেন্ট যেন বাস্তববোধকে আচ্ছন্ন না করে। ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে হিন্দু ভোটদাতারা আমাদের কোমর ভেঙে দিয়েছে। দেশবিভাগে বাধা দেওয়ার শক্তি আমাদের নেই। লক্ষ লক্ষ বিহারি ওড়িশি বাঙ্গলায় করে খাচ্ছে। তাই সেখানে বাঙ্গালিরা আছে। গোটা বাঙ্গলা পাকিস্তানে পড়লে তাদের ফিরে যেতে হবে। সেখানে তখন বাঙ্গালিরা থাকতে পারবে? কোটি কোটি বাঙ্গালি কোথায় যাবে? কে ঠাঁই দেবে? তাদের সবাইকে ধর্মত্যাগ করতে হবে নিজেদের বাঁচাতে। তাই বাঙ্গলার যতখানি সম্ভব রক্ষা করতে চেষ্টা করছি।' তিনি একটি সভায় দাবি করেছিলেন, 'If this succeeds, the East Pakistan will virtually perish.' পরবর্তীকালে তাই সত্যে পরিণত হয়েছিল। পাকিস্তান ভেঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ হয়ে গেল।

শোকসংবাদ

মালদা নগরের স্বয়ংসেবক তথা সরস্বতী শিশুমন্দিরের আচার্য সুশান্ত চৌধুরীর মাতৃদেবী শোভা চৌধুরী গত ১০ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি তাঁর স্বামী, ২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

মালদা নগরের স্বয়ংসেবক রবীন্দ্রনাথ দাস গত ২৭ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫০ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

মালদা নগরের বাঁশবাড়ি শাখার স্বয়ংসেবক সুদীপ্ত দাসের পিতৃদেব সুদাম দাস গত ১ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র ও ১ নাতি রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মালদা জেলার কলিগ্রাম শাখায় স্বয়ংসেবক অনিমেষ প্রামাণিকের মাতৃদেবী লীলারানি প্রামাণিক গত ২৫ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

উত্তর মালদা জেলার চাঁচল নগরের স্বয়ংসেবক সুমু ভট্টাচার্যের বাবা সমর ভট্টাচার্য গত ১৪ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বযংসেবক সঙ্ঘের বেহালা নগরের অরবিন্দ শাখার স্বয়ংসেবক আমাদের সবার প্রিয় সুভাষ চন্দ্র দাস গত ১৯ মে, ৬৪ বছর বয়সে অকস্মাৎ অকাল প্রয়াত হন। ভদ্র, সদালাপী, বন্ধুবৎসল, মিশুকে, নিষ্ঠাবান আদর্শ স্বয়ংসেবক সুভাষদা প্রায় ৪৫ বছর বয়সে সঙ্ঘে প্রবেশ করলেও তাঁর নিরহংকার ও সদাহাস্যময় স্বভাবের জন্য অল্পদিনের মধ্যে সবার মন জয় করে নিয়েছিলেন। বহু লোককে তিনি আর্থিকভাবে সাহায্য করেছিলেন, কাজ খুঁজে দিয়ে বহু পরিবারকে রক্ষা করেছিলেন। অত্যন্ত ব্যস্ত কর্মজীবন যাপন করেও দৈনিক নিয়মিত শাখায় যাওয়া তাঁর কাছে অবশ্য কর্তব্য ছিল। শুধু নিজে শাখায় যাওয়া নয়, আত্মীয়-বন্ধুদেরও সঙ্ঘমুখী করার চেষ্টাও করে গেছেন। সঙ্ঘ ছাড়াও ইসকন, বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের তিনি সহ-সম্পাদক হিসেবে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। এছাড়া ডাঃ সুজিত ধর ফাউন্ডেশন, ড. আশুতোষ মেমোরিয়াল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। একজন আদর্শ স্বয়ংসেবক রূপে তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সঙ্ঘের আদর্শকে রূপায়িত করার চেষ্টা করে গেছেন। এছাড়া সংগীত ও নাটকের গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি রেখে গেছেন তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, জামাতা এবং দুই নাতনি ও অসংখ্য গুণমুগ্ধকে।

প্রয়াত প্রচারক কাঞ্চন পল্লব বিশ্বাসের মাতৃবিয়োগ

গত ২৮ মে কাঁথি শহরে বার্ধক্যজনিত রোগে ৯৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যসেবী তথা কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রয়াত গঙ্গেশচন্দ্র বিশ্বাস (সান্যাল)-এর সহধর্মিণী। তাঁর ৫ পুত্রই স্বয়ংসেবক। জ্যেষ্ঠপুত্র খড়্গপুর আইআইটির পোস্টগ্র্যাজুয়েট শিক্ষিত টাউন অ্যান্ড কানট্রি প্ল্যানিং-এ, ন্যাশনাল স্কলারশিপ প্রাপক কাঞ্চন পল্লব বিশ্বাস (সান্যাল) সাতের দশকে সঙ্ঘের প্রচারক হন চাকরি ছেড়ে। তিনি ৪ পুত্র –কিংশুক, তমাল পারিজাত, পিয়াল ও ১ কন্যা মহুয়া আচার্য (সংস্কার ভারতীর প্রাক্তন কার্যকর্তা) এবং ৪ নাতি-নাতনিকে রেখে গেছেন। কোচবিহার শহরে তাঁর জন্ম ১৯২৭ সালে এক উচ্চশিক্ষিত বনেদি পরিবারে। সংগীতজ্ঞ ও সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় কাঁথির বহু সংগীত অনুষ্ঠানে তিনি বিচারকের আসনে বসতেন।

পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গ রাখার শপথ গ্রহণের দিন ২০ জুন

প্রকাশ চন্দ্র দাশ

ভারতে প্রত্যেক রাজ্যেরই একটা রাজ্য দিবস আছে। নেই শুধু পশ্চিমবঙ্গের। পশ্চিমবঙ্গের কোনো রাজ্য দিবস নেই। আমাদের কি পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে কোনো গর্ব নেই নাকি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনের ইতিহাস আমরা বিস্মৃত? ওই দুইই আংশিকভাবে হলেও সত্য। আজ পশ্চিমবঙ্গ ভারতে অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ, দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ রাজ্য। কিন্তু প্রতিবেশী রাজ্য বিহারও তো তাই। তবুও তো সেখানে পালিত হয় বিহার দিবস। নানান উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজ্যবাসী পালন করেন ওই দিনটি। তারা স্মরণ করেন বিহারের মহান ব্যক্তিত্বদের, তুলে ধরেন রাজ্যের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে, গর্ববোধ করেন একজন বিহারবাসী হিসেবে। আমরাও কি তাহলে পারি না বছরে একটি দিন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করতে? নিশ্চয় পারি। কিন্তু কবে পালন করব এই পশ্চিমবঙ্গ দিবস?

ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে সাধারণত রাজ্য প্রতিষ্ঠার দিনটিকেই রাজ্য দিবস হিসেবে পালন করা হয়। মহারাষ্ট্রে যেমন ১ মে, কর্ণাটকে ১ নভেম্বর, রাজস্থানে ৩০ মার্চ। এখন প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবসটি কবে? ভারতের অন্যান্য রাজ্য ও পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য রাজ্যগুলির অধিকাংশই ব্রিটিশ শাসনকালে বা স্বাধীন ভারতে রাজ্য পুনর্গঠনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে দেশভাগের সময়। অন্যান্য রাজ্যগুলির অধিকাংশই যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যত একক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু সেখানে সম্পূর্ণরূপে রাজ্যবাসীর ইচ্ছায়, রাজ্যের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে ও রাজ্যবাসীর

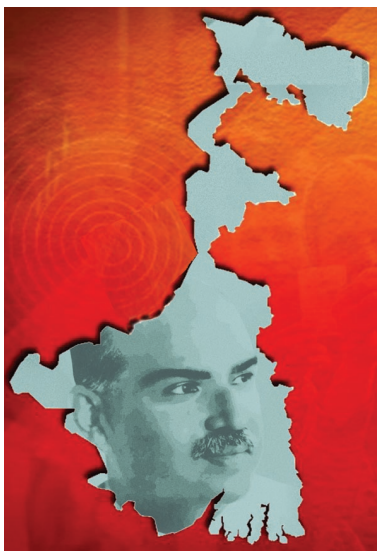

নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের বঙ্গীয় আইনসভায় সম্মিলিত ভোটদানের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনকালের শেষ লগ্নে দেশভাগ ছিল অনভিপ্রেত এক অনিবার্য পরিণতি। বিংশ শতকের গোড়া থেকেই বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রতিহত করতে ব্রিটিশ শাসনকগণ জাতীয়তা বিমুখ মুসলমান সমাজকে সাংবিধানিক শাসনতন্ত্রে অন্যায্যভাবে অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা দিতে থাকে। ১৯০৫ সালে মুসলমানদের জন্য এক পৃথক প্রদেশের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বঙ্গীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্য সংখ্যার অনুপাতে অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্ব প্রদান বঙ্গদেশে মৌলবাদের জন্ম দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ওয়াহাবি মানসিকতার পুনর্জন্ম হয় মুসলমান নেতৃত্বের মধ্যে। খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের প্রকৃত প্যান-ইসলামি স্বরূপ প্রকাশ পায় এবং স্বাধীন সার্বভৌম ইসলামি দেশের দাবির মধ্যে দিয়ে তা প্রকট হয়। মুসলিম লিগ যখন পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে জাতীয় নেতৃত্ব তখন তাকে 'ফ্যান্টাস্টিক নন্‌সেন্স' বলে উড়িয়ে দেন। পাকিস্তানের দাবিতে কলকাতার রাস্তায় হিন্দুর রক্তে হোলি খেলার পর নোয়াখালিতে হিন্দুদের সার্বিক গণহত্যা সংঘটিত হলে ক্ষমতালোভী জাতীয় নেতৃত্ব পাকিস্তানের দাবি মেনে নেয়।

মুসলমান নেতৃত্ব বাঙ্গলার পাকিস্তানভুক্তি দাবি করলে রাজ্যের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা বাঙ্গলার অমুসলমানদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ নামে এক নতুন রাজ্যের প্রস্তাব দেন, যা পাকিস্তানের পরিবর্তে ভারতের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা বলেন যে যুক্তিতে মাত্র ২৪ শতাংশ মুসলমান ভারতে থাকতে চাইছেন না, সেই একই যুক্তিতে বাঙ্গলার ৪৫ শতাংশ অমুসলমান পাকিস্তানের অনুর্ভুক্ত হতে চাইবেন কেন? অমৃতবাজার পত্রিকার একটি সমীক্ষায় দেখা যায় রজ্যের ৯৮.৬ শতাংশ অমুসলমান তাদের জন্য এক পৃথক রাজ্য চান। বুদ্ধিজীবী থেকে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ পশ্চিমবঙ্গের দাবিতে আন্দোলন করতে থাকেন।

আন্দোলনের প্রভাবে ব্রিটিশ শাসক তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হয়। তারা আইনসভায় ভোটাভোটির মাধ্যমে বিষয়টার মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত নেয়। ২০ জুন ১৯৪৭ বঙ্গীয় আইনসভার অমুসলমান সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পশ্চিমবঙ্গের দাবি সুনিশ্চিত হয়। শীঘ্রই প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্বে একটি সমান্তরাল মন্ত্রীসভা গঠিত হয়ে যায়। অমুসলমান আমলারা সুরাবর্দির পরিবর্তে প্রফুল্ল সেনকেই রিপোর্ট করতে শুরু করেন। জন্ম হয় পশ্চিমবঙ্গের।

আজ পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব সংকট। যে বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধারা এককালে দেশভাগ করে পাকিস্তান গঠন করেছিল সেই একই চিন্তাধারা আজ বকলমে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য

নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায়। ১৯৪০-এর দশকে শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের ইসলামি দেশের যে বীজ বপন করা হয়েছিল আজ পশ্চিমবঙ্গে সেই বীজ পুনরায় রোপিত হচ্ছে। আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গে যে নোয়াখালির পুনরাবৃত্তি হবে না তা কে বলতে পারে? না কোনো 'ফ্যান্টাস্টিক নন্‌সেন্স' নয়, বরং আরও কঠিন ও রূঢ় এক বাস্তব অপেক্ষা করছে পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য।

শুধু ভোট দিয়ে দায় সারলে চলবে না। ফেসবুকে লাইক করেও না। ধর্মনিরপেক্ষ নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের গালি দিয়েও কোনো লাভ নেই। ক্ষতি যা হবার তা হবে। অদূর ভবিষ্যতে শরণার্থী শিবিরে বসে কী উত্তর দেব নিজেকে? নিজের পরবর্তী প্রজন্মকে? সামনে দুটোই মাত্র পথ। শরণার্থী শিবিরের ভিক্ষার অন্নে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকা অথবা নিজগৃহে নিজের উপার্জনে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা। সিদ্ধান্ত আপনার। তৃতীয় কোনো বিকল্প নেই। পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গ রাখতে আমি আপনি কী করতে পারি? প্রথম নিজের পরিবারকে, দ্বিতীয় বন্ধুবান্ধব, তৃতীয় আত্মীয়দের মধ্যে এই দিনের ইতিহাস জানাতে হবে। শত্রু মিত্র চিহ্নিত করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই ধর্মীয় জনসংখ্যার অনুপাত আনতে হবে। সকল বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন করতে হবে। আমার পরবর্তী প্রজন্মকে নিরাপদ পশ্চিমবঙ্গ রেখে যাবার জন্য ঘরে ঘরে প্রতিদিন ইহুদিদের মতো শপথ নিতে হবে আগামীদিন ঢাকা খুলনায় মিলিত হবো। বিস্তারই জীবন, সংকোচনই মৃত্যু এটাই বিজ্ঞান, এটাই ধর্ম। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে হবে। শ্যামাপ্রসাদের উপহার দেওয়া পশ্চিমবঙ্গে আমাদের সন্তানদের এই মন্ত্র শেখাতেই হবে— অন্যায়ের প্রতিবাদ করো, প্রতিকার করো, প্রয়োজনে প্রতিশোধ নাও। সকল প্রকার হালাল আর দালালদের আর্থিক বয়কট করতেই হবে। যদি না করেন তাহলে আপনি পাপ করছেন। এটাই এই সময়ের ধর্ম। তসলিমাকে পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়ে আনতে হবে। সীতার অপমানে লঙ্কা দহন হয়েছিল। তসলিমার পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়ন আমাদের আগামীকাল উদ্বাস্তুর রাস্তার দিকে একধাপ এগিয়ে থাকা।

পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল আপনারই জন্য। পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার দায়িত্ব আপনারও। আজ যুবসমাজের এক বৃহৎ অংশের জানা নেই কোন পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমান সময়ের উপর সেই ইতিহাসের কী অপরিসীম গুরুত্ব। যুবসমাজের মধ্যে এই সচেতনতার একান্ত প্রয়োজন। সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই ২০ জুন পালিত হয় পশ্চিমবঙ্গ দিবস। আপনার অঞ্চলে, কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষক্ষেত্রে আপনিও পালন করুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস। শুধু দিবস পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই হবে না। আসুন, লড়াই করি পশ্চিমবঙ্গের জন্য। সংকল্প করি, প্রতিজ্ঞা নেই আগামী প্রজন্মকে এক সুন্দর পশ্চিমবঙ্গ দেওয়ার, যেখানে সকালে উঠে স্নান করে স্কুলে গিয়ে সরস্বতী বন্দনা করে ছাত্ররা পাঠ্যপুস্তকে রামধনু, পিতা, মাতা, নিমন্ত্রণ এই শব্দের সঙ্গে পরিচিত হবে। দুর্গাপুজোর ছুটি কাটাতে বেড়াতে যেতে পারবে এমনই এক পশ্চিমবঙ্গ। ▯

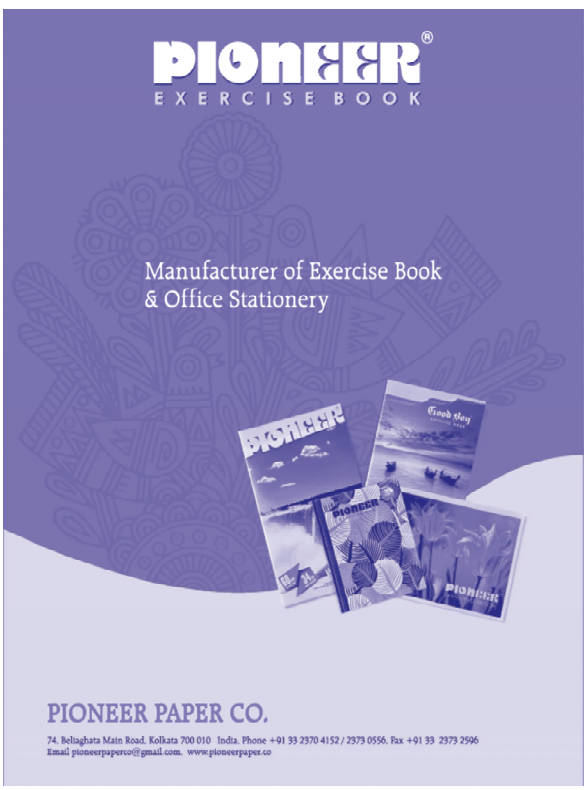

সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের সুরক্ষা পরিষদের দাবিদার ভারত

ডাঃ আর. এন. দাস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপরান্তে যুদ্ধের বিধ্বংসকারী পরিণতির কথা চিন্তা করে ১৯৪৪ সালে ওয়াশিংটনে তৎকালীন অন্যতম শক্তিধর দেশ আমেরিকা ও অক্ষশক্তির অন্যান্য সদস্য দেশগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জ (ইউএনও) গঠিত হয়। সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের কার্যসাধন পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণে প্রধান ছয়টি সংগঠন আছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সুরক্ষা পরিষদ (সিকিউরিটি কাউন্সিল)। যার কাজ হচ্ছে বিশ্বশান্তি এবং বিভিন্ন মহাদেশের শক্তিধর দেশগুলির সৈন্যশক্তির ভারসাম্য রক্ষার অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করা, সংযুক্ত রাষ্ট্রের অন্যান্য নতুন সদস্যদের 'জেনারেল এসেমব্লি' মানে সাধারণ সভায় তাদের নাম নথিভুক্ত করা এবং অত্যাবশকীয় প্রয়োজনে জাতিসংঘের শাসন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের অনুমোদন করা। এর ব্যাপক কার্যপদ্ধতির মধ্যে পড়ে সারা বিশ্বকে যে কোনও প্রকারে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করা। বিশ্বশান্তি রক্ষার গুরুদায়িত্বও আছে এই সংস্থার উপর। কোথাও বিদ্রোহ হচ্ছে যেমন সিরিয়া, সোমালিয়া বা ইয়েমেনে, সেখানে শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠানো অথবা কোনও দেশের উপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা দরকার যেমন সদাকুপিত কিম জুং-আনের উত্তর কোরিয়া আর ইজরাইলের বিনাশকামী হাসান রুহানি আর বিশ্বত্রাস আয়াতোল্লা খোয়েমনির দেশ ইরানের উপর আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা কিম্বা কোথাও সবদেশের সম্মিলিত সৈন্যশক্তি প্রয়োগ করে সেই দেশটিকে বাঁচানো একান্ত প্রয়োজন যেমন, ইরাক আর সিরিয়ায় করা হয়েছিল। এই সুরক্ষা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত আজীবন স্থায়ীপদে বহাল আছে পাঁচটি শক্তিশালী দেশ, যেমন আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া আর চীন। সবাই ১৯৪৫ সাল থেকেই এই স্থায়ী সদস্যপদের সুযোগসুবিধা ভোগ করে আসছে এবং ভেটো শক্তির দ্বারা অন্যকে দমিয়ে রেখেছে। একথা বলার অনেক কারণ আছে। আমেরিকা ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ভিয়েতনামের সঙ্গে পাক্কা ২০ বছরের লম্বা যুদ্ধ চালিয়ে এসেছে। কেউ আটকাতে পারেনি। চীন ১৯৫১ সালে তিব্বতকে গ্রাস করেছে 'শান্তিপূর্ণ আত্মসাৎ' পদ্ধতির মাধ্যমে। গোটা পশ্চিমি দুনিয়া হাঁ করে দেখেছে কিন্তু চীনের কমিউনিস্ট নেতাদের বিরুদ্ধে বলার সাহস দেখায়নি। সেই থেকেই হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় দালাই লামা ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে আছেন।

নেহেরুর চীন সফরের অব্যবহিত পরেই, ১৯৬২ সালে চীন বিনা প্ররোচনায় ভারতকে আক্রমণ করে লাদাকের অনেকটা অংশ যাকে আমরা 'আকসাই চীন' বলি, তা দখল করে নিয়েছে শুধুমাত্র গায়ের জোরে। আন্তর্জাতিক মহলে কোনও উচ্চবাচ্য হয়নি! ইউরোপের দুটি চিরস্থায়ী শত্রুদেশ— ব্রিটেন ও ফ্রান্স স্থায়ী সদস্যপদে বসে আছে সেই ১৯৪৫ সাল থেকে। আমেরিকা আর এশিয়া মহাদেশে—দুই মেরুর দুই যুযুধান মহারথী অর্থাৎ চীন ও আমেরিকা, একে অপরের চিরশত্রু কিন্তু এই সংস্থার আজীবন স্থায়ী সদস্য হয়ে বসে আছে। এশিয়া আর ইউরোপ জুড়ে বিশালাকার রাশিয়া যা আগে সংযুক্ত সোভিয়েত মহাসঙ্ঘ নামে পরিচিত ছিল সেও এই সংস্থার পঞ্চম স্থায়ী সদস্য। আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মতো বিশাল ভূভাগ কিম্বা দক্ষিণ আমেরিকা বা আফ্রিকার মতো বিশাল দেশগুলির কোনও স্থায়ী প্রতিনিধি নেই সুরক্ষা পরিষদে আজ পর্যন্ত! এটা যেন পক্ষপাতদুষ্ট বিশ্বের কয়েকটি বাছাইকরা মহাশক্তির গাজোয়ারি মনোভাবের অভিব্যক্তি!

অখণ্ড ভারতের বিশাল আকারের জন্য তাকে উপমহাদেশও বলা হতো। অসংখ্যবার তাকে খণ্ডিত করা হয়েছে। ইরানকে আর্যাবর্ত থেকে ১৩৭৮ সালে বিযুক্ত করা হয়। মহাভারতের গান্ধারীর দেশ আজকের আফগানিস্থানকে ১৮৭৯ সালে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। ধর্মের ভিত্তিতে জীবন্ত ভারতের শেষ দ্বিখণ্ডন ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক এক কট্টর ইসলামিক দেশের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন করা হয়। আজ ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের পূর্বে বাংলাদেশ আর পশ্চিমে পাকিস্তান, দুটি ইসলামিক জিহাদের পীঠস্থান, যা সারাবিশ্বে আতঙ্কের বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে। চীন বারবার তার ভেটো শক্তির সাহায্যে পাকিস্থানে লুকিয়ে থাকা মাসুদ আজাহার আর তার সন্ত্রাসবাদী পার্টি জৈইস-ই-মোহম্মদকে রক্ষা কবচের মতো কাজ করে যাচ্ছে। সারা পৃথিবী দেখছে কিন্তু কিছুই করতে পারছে না! যেমন ২০০১ সালে সারাবিশ্ব দেখেছিল ২৫০০ বছরের পুরানো ২৫০০ মিটারের উঁচু দাঁড়ানো বুদ্ধমূর্তিকে তালিবান সর্দার মোল্লা মোহম্মদ ওমরের নির্দেশে তোপ দেগে ধ্বংস করা হচ্ছিল অথচ কেউ কিছুই করতে পারেনি!!

সুরক্ষা পরিষদে অস্থায়ী ১১টি সদস্যপদ আছে। বেলজিয়াম আর ডোমেনিকান রিপাবলিকের মতো ছোট দেশগুলিও ২০২০ তে অস্থায়ী সদস্যপদ পেয়েছে কিন্তু ভারতের কপালে শিঁকে ছিঁড়ছে না। অস্থায়ী পদগুলির সময় সীমা মাত্র ২ বছর। আগামী ২০২১- শের অস্থায়ী সদস্যদের মধ্যে আছে এসটোনিয়ার মতো ছোট্ট এক দেশও কিন্তু ভারতকে রাখা হয়নি সেই তালিকায়। আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখি, স্থায়ী সদস্যদের সবাই মানে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স আর রাশিয়া ভারতের স্থায়ী সদস্য পদের সমর্থন করলেও পাকিস্তানের সবসময়ের সখা চীন ভেটোশক্তির অপব্যবহার করে ভারতকে প্রতিবারই স্থায়ী সদস্যতার নির্বাচনে যোগ্যতার মাপকাঠিতে অযোগ্য প্রমাণিত করেছে। আশ্চর্য লাগে, যখন দেখি জি-৪ দেশগুলির সবাই অর্থাৎ ব্রাজিল, জাপান আর জার্মানি ভারতের সদস্যতার পূর্ণ সমর্থন করছে অথচ ভারত সদস্যতা পাচ্ছে না! গত ৭৫ বছরে, মাত্র ১৪ বৎসর অর্থাৎ ৭ বারের জন্য ভারতকে অস্থায়ী সদস্যপদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। জেনারেল অ্যাসেম্বলির ১৯৩টি দেশের দুই তৃতীয়াংশের ভোট পেলে তবেই কোনও দেশ অস্থায়ীপদে সদস্যতা পায় তাও মাত্র ২ বছরের জন্য। আর ১৯৪৫ সাল থেকে স্থায়ী পাঁচ মূর্তিমান সদস্যরা বসে আছেন এবং থাকবেনও পৃথিবী বিনাশের শেষ দিন পর্যন্ত! খুব আশ্চর্য লাগছে না? মহাভারতের দুর্যোধনের নীতির মতোই, তাই না!! ১৭ই জুন, ২০২০ তে সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জে নির্বাচন হয়েছিল সুরক্ষা পরিষদের অস্থায়ী পদের জন্য। ভারত অস্থায়ী সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে।

সারাবিশ্বের সমীক্ষায় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী ভারতমাতার সুসন্তান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত অচিরেই সংযুক্ত রাষ্ট্র সঙ্ঘের সুরক্ষা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ পাবে এবং ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে!

ভারত সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদে যেমন জি-৪, জি-৭৭ এবং চার্টার সদস্য হয়ে বসে আছে অনেকদিন কিন্তু সুরক্ষা পরিষদে নেই। কিন্তু কেন এই বৈষম্য? সুরক্ষা পরিষদের প্রতিটি স্থায়ী সদস্যদেশ কি ভারতের চেয়ে আয়তনে, সামরিক শক্তিতে, জি.ডি.পি. বা অর্থনৈতিক সামর্থের নিরিখে অনেক উন্নত? ২০২০'র সর্বশেষ হিসাব মতে সর্বোচ্চ স্থানে আছে আমেরিকার জি.ডি.পি. ২১.৪ মিলিয়ন, তারপর ক্রমান্বয়ে চীনের ১৪.১, জাপানের ৫.১, জার্মানির ৩.৮, ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডের ২.৭ আর ভারতের তাদের থেকেও বেশি ২.৯ মিলিয়ন। ভারতের স্থান সাধারণ জি.ডি.পিতে পঞ্চম দেখালেও ক্রয়ক্ষমতার নিরিখে বিশ্বে তৃতীয় স্থানে আছে। আই.এম.এফের বর্তমান প্রধান বুলগেরিয়ার অর্থনীতিবিদ ক্রিসটালিনা জর্জিওভার মতে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার এশিয়ার সমস্ত দেশের থেকে সবথেকে বেশী গতিসম্পন্ন।

সারাবিশ্বের জনসংখ্যার অনুপাতে ভারতের জনশক্তি ১.২৬ বিলিওন, চীনের ১,৪০ বিলিওনের পরেই অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থানে। আমেরিকার জনসংখ্যা মাত্র ৩২৯

মিলিয়ন। অর্থাৎ ভারতের জনশক্তি ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা আর রাশিয়ার সম্মিলিত জনসংখ্যারও অনেক বেশি।

এবার দেখা যাক, সৈন্যশক্তির অনুপাত। ভারতের সৈন্যক্ষমতা চীনের পরেই মানে দ্বিতীয় স্থানে। সক্রিয় কার্যরত সৈন্যশক্তির হিসাবে ভারতের কাছে ১৪ লক্ষ, চীনের ২০ লক্ষ আর আমেরিকার ১৩ লক্ষ। অতিরিক্ত সেনাবাহিনীর হিসাবে ভারতের স্থান চীনের উপরে আছে। চীনের আছে মাত্র ৫ লক্ষ ১০ হাজার, আমেরিকার ৮ লক্ষ ৪৫ হাজার আর ভারতের আছে ১১ লক্ষ ৫৫ হাজার। ব্রিটেন, ফ্রান্স বা রাশিয়ার সৈন্যশক্তির চেয়ে ভারত অনেক এগিয়ে আছে। সামরিক দিক দিয়ে ভারত আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা বাহিনীতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সৈনিক প্রদান করে। রোয়ান্ডা, সেনেগাল, কঙ্গো ইত্যাদি অসংখ্য দেশের বিদ্রোহ দমনে বা সন্ত্রাসবাদী হামলাতে প্রতি বছর ৬৫০০ ভারতীয় সেনা যা আমেরিকা, চীন, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও রাশিয়ার থেকে অনেক বেশি যোগদান করে ও জীবন বিসর্জন দেয়।

পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলির মধ্যেও ভারত ষষ্ঠ স্থানে আছে। চীন, আমেরিকা আর ভারতে—সারাবিশ্বে মাত্র এই তিনটি দেশেরই স্থল, নৌ আর বিমানবাহিনী পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত আছে। ইংল্যান্ডের পারমাণবিক শক্তি চালিত সাবমেরিনগুলি বিশ্বে অদ্বিতীয়। ফ্রান্সের বায়ুসেনা আর নৌবাহিনীতে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হয়। পারমাণবিক অস্ত্র ভাণ্ডারে সর্বপ্রথম আমেরিকা তারপরে রাশিয়া এবং চীনের স্থান তৃতীয়। আমেরিকা ১০০০ টারও বেশি পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা করেছে। রাশিয়ায় হয়েছে ৭০০ টির বেশি। ফ্রান্স আর ইংল্যান্ড প্রত্যেকে করেছে ৪৫টি করে। ভারত করেছে মাত্র ৬টি। রাজস্থানের মরুভূমি পোখরানে, ১৯৭৪ সালে 'স্মাইলিং বুদ্ধ' নামে বিস্ফোরণ করার পর অটলজীর প্রেরণায় প্রয়াত ভারতের 'মিসাইল ম্যান' আবদুল কালামের নেতৃত্বে সফল বিস্ফোরণটি হয়। পারমাণবিক শক্তির উৎস হিসাবে প্লুটোনিয়ামকে ব্যবহার করে ১৫০–২০০ টির বেশি পারমাণবিক বোমা তৈরির ক্ষমতা ভারতের সেনাবাহিনীর কাছে আছে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পরমাণু বিজ্ঞানীদের মধ্যে ভারতের স্থান ষষ্ঠ।

আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া আর চীনের পর ভারতই একমাত্র দেশ যে, সাধারণ আনবিক বোমার ২০০ গুণ বেশি শক্তিসম্পন্ন হাইড্রোজেন বোমার সফল পরীক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। সৌরশক্তির উৎপাদনে চীন, আমেরিকার পরই ভারতের স্থান। ভারত ২০১৬ তে ১৬১ মেগাওয়াট সৌরশক্তি উৎপাদন করে যেটা ২০২০ তে অবিশ্বাসনীয় ৩৭ গিগাওয়াটে পরিণত হয়। এটা ভারতের পক্ষে সৌরশক্তির পরাক্রমে এক বিস্ময়কর সাফল্য।

আয়তনের হিসাবে দেখলে, খণ্ডিত ভারতের আয়তন, ফ্রান্স আর ব্রিটেনের সম্মিলিত আয়তনের ৩ গুণ বেশী। দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম দেশ, এশিয়ার মধ্যে তৃতীয় আর সারাবিশ্বে সপ্তম স্থানে আছে আমাদের ভারত। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে দেখলে ভারত সারাবিশ্বের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। উত্তরে হিমালয়ের অভেদ্য প্রাচীর আর দক্ষিণে তিন সমুদ্রের বিশাল জলরাশি। আজকের পাক অধিকৃত কাশ্মীর সংলগ্ন গিলগিট-বালটিস্তানের অধিবাসীরা আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন ৭০০ বছর পূর্বে পাঠানদের দ্বারা পরাজিত ও বন্দি মারাঠা নারী-পুরুষদের কথা যারা ছিলেন তাদেরই পূর্বপুরুষ। আর এই পথ দিয়েই অর্থাৎ 'সিল্ক রুট' দিয়েই প্রাচীন ভারতের সামরিক অভিযান ছাড়াও, বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মতের বিনিময় হতো, জাপান, কোরিয়া, মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, ইরান, আফ্রিকা আর ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে। যার এত ভূসম্পদ, এত সৌরশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা কেন তাকে সুরক্ষা পরিষদে স্থায়ী পদ দেওয়া হয় না?

ইদানীং সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের কার্যাবলীতে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে সারাবিশ্ব সোচ্চার হয়ে উঠেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান ইথিওপিয়ার ডা. টেড্রোস অবগত থাকলেও চীন থেকে ছড়ানো বিশ্বব্যাপী 'করোনা মহামারীর' কথা চেপে গেছিলেন ২০১৯-এর নভেম্বরে। মানুষ থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রমণের কথা নিজে জানলেও অন্যকে জানাননি এবং চীনের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছিলেন। 'তাছাড়া ইজরাইল আর প্যালেস্টাইন বিবাদে সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জ সবসময়ই সন্ত্রাসবাদী সংস্থাটির কথাই শোনে বা পরোক্ষে সমর্থন জানায়'---এমনই অভিযোগ করেছিলেন আমেরিকার প্রতিনিধি নিকি হ্যালি।

ভারত পৃথিবীতে সামরিক আর জনশক্তির নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে আছে, আয়তনে ৭ম বৃহৎ দেশ, সারাবিশ্বে দ্বিতীয় আর এশিয়াতে সর্বপ্রথম সব থেকে দ্রুতগতিতে যার আর্থিক বিকাশ ঘটে চলেছে, সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে ৪র্থ স্থানে যে দেশ সৈন্যশক্তি দিয়ে সাহায্য করে এবং প্রতি বছর হাজার হাজার সেনার মৃত্যু হয়, বিদেশের মাটিতে বিশ্বের শান্তি রক্ষার্থে, সেই দেশ ভারতকে একদেশদর্শিতার শিকার হতে হয়েছে গত ৭৫ বছর ধরে।

অস্ট্রেলিয়ান ইতিহাসকার, ভারত তত্ত্ববিদ ও লেখক এ.এল.বসম, যাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৯৮৬ সালে এই কলকাতায়, তাঁর কথা দিয়েই এই প্রবন্ধের ইতি টানব। তাঁর লেখা বিখ্যাত পুস্তক, 'দি ওয়ান্ডার দ্যাট ওয়াস ইন্ডিয়া'তে আছে, 'কালের প্রভাবে মেসপটামিয়া, গ্রিক আর মিশরের সভ্যতা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু প্রাচীন ভারতের প্রজ্ঞা আর সংস্কৃতি আজও সমানভাবে বয়ে চলেছে তার ধমনীতে। সারাবিশ্বের ভাষার জননী, ঐতিহ্যের মাতামহী আর সংস্কৃতির প্রপিতামহী হচ্ছে ইন্ডিয়া'।

সারাবিশ্বের সমীক্ষায় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী ভারতমাতার সুসন্তান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত অচিরেই সংযুক্ত রাষ্ট্র সঙ্ঘের সুরক্ষা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ পাবে এবং ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে!□

যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও জাপান জোটের বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে সঙ্গে চায় চীন

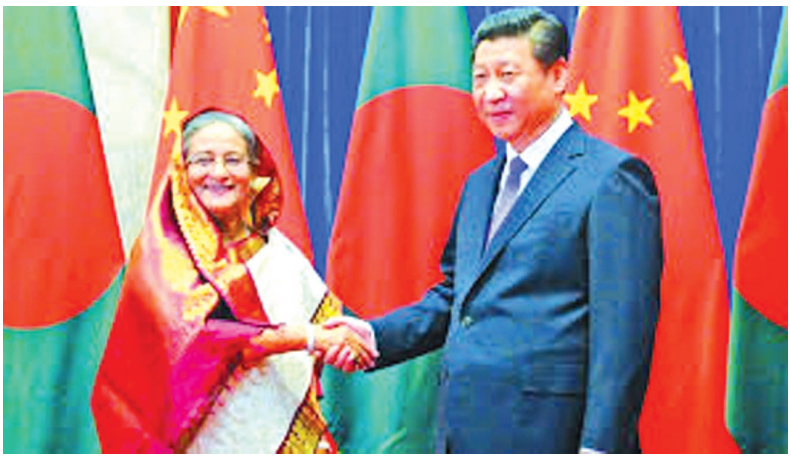

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গণহত্যা চালাতে ও মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মূল করতে পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করেছিল চীন। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় রুখতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সামরিক সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা রুখতে পারেনি। সেই জেদে স্বাধীন বাংলাদেশকে চীন স্বীকৃতি দেয়নি, জাতিসঙ্ঘে সদস্যপদ লাভে বাধা সৃষ্টি করে বারবার। বাংলাদেশ চীনের স্বীকৃতি পায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নিহত হওয়ার পর। তৎকালীন দখলদার সামরিক সরকারের সঙ্গে কিন্তু সম্পর্ক স্থাপন করেছিল চীন, সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয় নানাভাবে। এসেছিল সামরিক সহায়তাও। পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামি লিগ সরকারের সঙ্গেও সম্পর্ক গভীর হয়, যে সরকারের নেতৃত্বে আছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা।

সম্পর্কের উন্নতি ঘটেছে বটে, ২০১৬ সালের অক্টোবরে চীনের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সফরে এসে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর) ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে শ্রদ্ধা জানাতে যাননি। সাধারণত বাংলাদেশে যে বিদেশি অতিথিরা সফরে আসেন তাদের পরিদর্শন তালিকায় থাকে বঙ্গবন্ধু ভবন। কিন্তু গত ২৭ এপ্রিল মহামারী করোনার মধ্যে মাত্র সাত ঘণ্টার ঝটিকা সফরে ঢাকা ছুটে এসে চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল ওয়েই ফেঙ্গহি প্রথমেই তড়িঘড়ি বঙ্গবন্ধু ভবনে দৌড়লেন, শ্রদ্ধা জানালেন বঙ্গবন্ধুকে। এই প্রথম চীনের কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে শ্রদ্ধা জানাতে গেলেন। সফরের উদ্দেশ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ভারতসহ চারটি দেশের কৌশলগত অনানুষ্ঠানিক নিরাপত্তা সংলাপ বা কোয়াড নিয়ে চীনের উদ্বেগের কথা বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো। চীনের ভাষায় দক্ষিণ এশিয়ার শান্তিপূর্ণ উন্নয়ন অব্যাহত রাখার স্বার্থে বাইরের শক্তির এমন 'সামরিক জোটের' বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে পাশে পেতে চায় চীন। তবে চীনের প্রস্তাবে বাংলাদেশ কোনও সাড়া দেয়নি।

ভারতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ভয়াবহ রূপ নেয়ায় ভারত বাংলাদেশসহ অনেক দেশে চুক্তি অনুযায়ী টিকা পাঠাতে ব্যর্থ হয়েছে। আর এই সুযোগটি গ্রহণ করে চীন। যদিও চীনা টিকার মান নিয়ে নানা প্রশ্ন আছে।

এবার সংক্ষিপ্ত সফরে ঢাকায় এসে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী চীনের গুরুত্বপূর্ণ একজন মন্ত্রীর প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যাওয়াটা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনৈতিক বিশ্লেষকেরা। চীন করোনার টিকার নাম করে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও পাকিস্তানকে নিয়ে একটি জোট তৈরি করে ফেলেছে। অথচ প্রতিবেশী বাংলাদেশ, নেপাল, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কা সবার আগে ভারত থেকে টিকা উপহার পেয়েছে। পাকিস্তানেও টিকা পাঠানো নিয়ে কথা হচ্ছিল। কিন্তু মার্চ থেকে ভারতে করোনা ভয়াবহ রূপ নেয়ায় ভারত বাংলাদেশসহ অনেক দেশে চুক্তি অনুযায়ী টিকা পাঠাতে ব্যর্থ হয়। আর এই সুযোগটি গ্রহণ করে চীন। যদিও চীনা টিকার মান নিয়ে নানা প্রশ্ন আছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল ওয়েই ফেঙ্গহি ঢাকা সফরের সময় রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে কোয়াড নিয়ে বেইজিংয়ের অস্বস্তির কথা জানান। সেই সঙ্গে এ অঞ্চলে 'কোয়াড' যাতে আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে, সে জন্য দুই দেশের একসঙ্গে কাজ করার বিষয়েও বেইজিংয়ের প্রত্যাশা তুলে ধরা হয়েছে।

চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সেনাপ্রধানের সঙ্গেও বৈঠকে মিলিত হন। মূলত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের উপস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য গঠিত যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের কৌশলগত জোট 'কোয়াড' নামে পরিচিত।

ঢাকা সফরের সময় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী কোয়াড নিয়ে কোনো আলোচনা করেছিলেন কিনা, তা নিয়ে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে ২৭ এপ্রিল রাতে চীনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়া ঢাকা থেকে 'বাংলাদেশ, চীন সামরিক সহযোগিতা বাড়াতে সম্মত' শিরোনামে একটি খবর প্রকাশ করে। এতে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ায় বাইরের কোনো শক্তির সামরিক জোট গঠনের চেষ্টা এবং আধিপত্য বিস্তার রুখতে এবং আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে দুই পক্ষের যৌথ প্রয়াস চালানো উচিত।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেন, চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে কোয়াডের প্রসঙ্গটি আলোচনায় তুলেছেন বলে জেনেছি। তিনি চীনের অবস্থানের কথা বলে গেছেন। তিনি যা বলেছেন, তা বাংলাদেশ সমর্থন করে এমনটা নয়। তিনি যা বলেছেন বাংলাদেশ শুনেছে। কৌশলগত উদ্যোগের বিষয়ে বাংলাদেশ সব সময় বলে আসছে দেশের স্বার্থ সমুন্নত রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদান থাকলে বাংলাদেশ তাতে যুক্ত হবে। কোনো উদ্যোগে নিরাপত্তার বিষয়টি থাকলে বাংলাদেশ তাতে যুক্ত হবে না।

কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের একপর্যায়ে চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল ওয়েই ফেঙ্গহি বেইজিং-দিল্লি এবং বেইজিং-ওয়াশিংটন সম্পর্কের বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। এ সময় জেনারেল ওয়েই গালোয়ান উপত্যকায় ভারতের সঙ্গে গত বছরের সীমান্ত সংঘাতের প্রসঙ্গ টেনে উল্লেখ করেন, ভারত সীমান্ত আইন লঙ্ঘন করায় সেখানকার পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। তবে দুই পক্ষ আলোচনা করে সীমান্তে এখন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখেছে।

জানা গেছে, এরপর বেইজিং-ওয়াশিংটন সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে গিয়ে জেনারেল ওয়েই ফেঙ্গহি মার্চে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের উদ্যোগে আয়োজিত কোয়াড শীর্ষ নেতাদের ভার্চুয়াল আলোচনার কথাটি তোলেন। অবাধ ও মুক্ত ভারত প্রশান্ত মহাসাগরের নামে চীনবিরোধী একটি জোট হচ্ছে বলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কাছে মন্তব্য করেন চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, মার্কিন উদ্যোগ ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় কৌশলের (ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজিন আইপিএস) বিরোধিতার কোনো ইচ্ছে চীনের নেই। তবে চীন এ অঞ্চলের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে চায়। তাই উন্নয়নের স্বার্থে শান্তি ও স্থিতিশীলতা জরুরি। তাই এ অঞ্চলের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন অব্যাহত রাখার স্বার্থে বাংলাদেশকে পাশে চায় চীন। তবে সরকারের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এমন আকাঙ্ক্ষা বা প্রত্যাশার বিষয়ে রাষ্ট্রপতি কোনো মন্তব্য করেননি।

চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সফরের আগে কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকেরা মন্তব্য করেছিলেন, কোভিড-১৯-এর দ্বিতীয় ঢেউয়ে যখন অনেক দেশ আবার টালমাটাল, তখন বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বিষয়ে সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ঢাকা সফর নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। আর ঢাকায় সংক্ষিপ্ত সফরের সময় দুই দেশের প্রতিরক্ষা সহযোগিতার পাশাপাশি টিকা কূটনীতি আর পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনীতি নিয়ে কথা বলে গেলেন চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে। সর্বশেষ টিকা নিয়ে সংকটের প্রেক্ষাপটে চীনের কাছ থেকে টিকা পেতে আলোচনা চলছে। ১৯৭৭ সাল থেকে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যাপকতর প্রতিরক্ষা সহযোগিতা রয়েছে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য কেনা সমরাস্ত্রের বড় উৎস চীন। আর বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম সাবমেরিনও কেনা হয়েছে চীন থেকে। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ছাড়াও বিমানবাহিনী ও কোস্টগার্ডের জন্য বিভিন্ন ধরনের সামগ্রীও চীন থেকে কেনা হয়েছে।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা হৃদয়ঙ্গম করেই হিন্দু সমাজকে উঠে দাঁড়াতে হবে

ধর্মপুত্র

প্রত্যেক বছর নির্দিষ্ট দিনে ভারতীয় হিন্দু সমাজ ছত্রপতি শিবাজীর মহারাজের সিংহাসন আরোহণের শুভদিন স্মরণে পরম শ্রদ্ধায় হিন্দুসাম্রাজ্য দিনোৎসব উদ্‌যাপন করে। জ্যৈষ্ঠ শুক্ল ত্রয়োদশী তিথি ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকের দিন। দেশের বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতিতে জনসাধারণের জানা প্রয়োজন হিন্দু জাতি তথা ভারত রাষ্ট্রের জন্য দিনটি কেন এতো গুরুত্বপূর্ণ। নয়তো মানুষের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ভারতবর্ষের এতগুলি রাজ্য থাকতে, দেশের হিতার্থে ও দেশ রক্ষার্থে লড়াই করে বিজয় প্রাপ্ত করেছিলেন এমন আরও বহু রাজা থাকতে, কেবলমাত্র মহারাষ্ট্রের এক বীর যোদ্ধা রাজার রাজ্যাভিষেকের দিনটিই কেন এতো গুরুত্বপূর্ণ? আমরা বাঙ্গালি হিন্দুরাই-বা এই বিশেষ উৎসবের দিনটি থেকে কী শিক্ষা নিতে পারি?

স্বাধীনতার ৭০ বছরে দেশের ভিতরে বহু ভেদাভেদ, প্রাদেশিকতার প্রকোপ অত্যন্ত কদর্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই এমন প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক। উত্তর খোঁজার জন্য শিবাজী মহারাজের সময়কালীন পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে আজকের পরিস্থিতি কী হয়েছে, তা আমাদের বিচার করতে হবে।

আজ দেশের ভিতরে-বাইরে এক অত্যন্ত সংকটময় পরিস্থিতি এসে উপস্থিত হয়েছে। হিন্দুদের নানাভাবে বিভ্রান্ত করে দেশবিরোধী শক্তি খ্রিস্টান ও ইসলামে ধর্মান্তরকরণের কাজে দিনরাত লেগে রয়েছে। হিন্দু সমাজ প্রতিনিয়ত, প্রতি মুহূর্তে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, দুর্বল হয়ে পড়ছে। দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে হিন্দুর আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি।

সেদিনও চতুর্দিক থেকে এমনই ভীষণ সংকট এসে উপস্থিত হয়েছিল। দেশজুড়ে ইসলামি শাসনের ফলে সমাজে ঘোর অন্যায় অত্যাচার, ধর্মীয় জুলুম ও উৎপীড়ন চলছিল। মহম্মদ বিন কাশিমের অতর্কিত ও নৃশংস আক্রমণের পর থেকেই সনাতন ভারত বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। তবুও তারই মধ্যে দেশের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ সংরক্ষণের মাধ্যমে হিন্দুরাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রয়াস নিরন্তন চলছিল। রাজারা বিভিন্ন রণনীতির সাহায্যে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রেখেছিলেন, 'সাধু সমাজ' নিরন্তরতার সঙ্গে সমাজে একতার ভাব ফিরিয়ে আনার, একত্রিত করে তোলার, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ধরে রাখার

জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সেইসব প্রয়াসের অন্তিম ফল হলো শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক।

আজকের মতো সেদিনও ভারতীয় সমাজ তার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট ও দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। সমাজের আত্মগৌরব ও আত্মবিশ্বাস হারানোই ছিল আজকের মতো সেদিনেরও সবচেয়ে বড়ো সংকট।

স্বামী বিবেকানন্দের কথায়, যে ব্যক্তির ভগবানের উপর আস্থা নেই, সে কখনোই আস্তিক হতে পারে না। যে আস্তিক নয়, ধর্মের আধারে যার বিশ্বাস নেই, সে কখনো আত্মবিশ্বাসীও হতে পারে না। ধর্মের আধারহীন অধার্মিক বৈচারিক প্রবাহের কারণে সমগ্র ভারতীয় সমাজ আজ আবার আত্মবিশ্বাসহীন, হীনবল হয়ে পড়েছে। ব্যক্তির উপর ব্যক্তির, পরিবারের এক সদস্যের উপর অন্য সদস্যের, প্রতিবেশীর উপর প্রতিবেশীর, ব্যক্তির উপর থেকে সমাজের এবং সমাজের উপর থেকে ব্যক্তির আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়েছে। বিশ্বাসের জায়গায় অনুপ্রবেশ ঘটেছে সন্দেহ ও বিদ্বেষের।

কিন্তু দেশে প্রথমবার বিদেশি বিধর্মী পরতন্ত্র প্রবেশ করার পর থেকে শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত সময়কালে ভারতীয় সমাজে এক নতুন বোধ জাগ্রত হয়েছিল। মানুষ বেশ বুঝতে পারছিলেন যে এক ভয়ংকর দুষ্টচক্র প্রবেশ করেছে দেশে, যা শুধুমাত্র শাসন ব্যবস্থাই কুক্ষিগত করে না, শুধু মন্দির ধ্বংস আর মানুষের সম্পত্তিই লুঠ করে না, বরং তা মানুষকেই সমূলে বদলে দেওয়ার চেষ্টা করে, আর সেই কাজে কৃতকার্য না হতে পারলে, মানুষকে উচ্ছেদ করে তাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করে। সেই বর্বর বৈদেশিক অপশাসনের পরবর্তী পাঁচশো বছর ধরে দেশে যে অন্যায় অত্যাচার চলে আসছিল তার একটা সমাধান পাওয়া গেল শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকের মাধ্যমে। 'হিন্দুসাম্রাজ্য দিনোৎসব'-এর গুণমাহাত্ম্য এখানেই। সহস্র বছরের আগ্রাসী বিদেশি ইসলামিক শাসনের পরাধীনতা ও আত্মবিস্মৃতির অতল থেকে হিন্দু জাতি তথা ভারতবর্ষকে আবার 'হিন্দবী স্বরাজ্যে'র আত্মশক্তির উন্মেষের মাধ্যমে উদ্বোধিত করতে আবির্ভূত হলেন হিন্দু কুলগৌরব ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ। তাঁর দুর্জয় সাহসী উদ্যম দেখে দেশবাসীর মনে আবার ভরসা জাগলো, যে, হিন্দু সমাজ, হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রকে আবার প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। শুধু মহারাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের মনেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ, রাজন্যবর্গ ও তৎকালীন সাধু-সমাজের মনেও নতুন আশার সঞ্চার হয়েছিল, অত্যাচারী দুর্বিষহ ইসলামি শাসনের মধ্যে যদি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক ও সিংহাসনে আরোহণ সম্ভব হয়, তাহলে সমগ্র দেশে আরও একবার সনাতন ধর্ম-সংস্থাপন সম্ভব হবে।

যখন শিবাজী ক্রূর ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রায় গিয়েছিলেন, তখন গোটা ভারতবর্ষ তথা সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজ উদগ্রীব হয়ে সেদিকেই তাকিয়ে ছিল। সকলেরই লক্ষ্য ছিল 'হিন্দবি স্বারাজ্যে'র পুনঃস্থাপন, ম্লেচ্ছ বিধর্মীর হাত থেকে নিঃস্কৃতি। আর শিবাজী যখন সুকৌশলে তাঁর সদা বিশ্বস্ত সহযোদ্ধাদের সহযোগিতায় সুস্থ শরীরে ঔরঙ্গজেবের কারাগার থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেন, তখন তিনি স্ব-ইচ্ছায় সিংহাসনে আরোহণ করলেন। এর ফলে নিজেদের মধ্যে নানান বিবাদে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা তৎকালীন রাজপুত রাজারাও নিজেদের সব বিবাদ ভুলে 'দুর্গাদাস রাঠোরের' নেতৃত্বে এক শক্তিশালী হিন্দু যোদ্ধাবাহিনী গঠন করলেন, আর তার কয়েক বছরের পর পরিস্থিতি এমন পরিবর্তন হলো যে সম্পূর্ণ রাজস্থান থেকে বিদেশি বিধর্মী মুসলমান আক্রমণকারী পলায়ন ও পশ্চাৎপসরণ করতে বাধ্য হলো।

এরপর অচিরেই শিবাজী মহারাজের শৌর্যশিখার দীপ্তি দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো ভারতময়। জীবৎকালেই তিনি বহু ভারতীয় রাজার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন। শূর-বীর কুশল সংগঠক ও প্রতাপী 'বুন্দেলাখণ্ড কেশরী' রাজা ছত্রসাল বুন্দেলা' শিবাজীর আশিষধন্য হয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এমন এক শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন যে দুর্বিনীত দুষ্কৃতী মুঘলরা আর কোনোদিনই তা ভেদ করতে পারেনি। তিনিই স্থাপনা করেছিলেন স্বাভিমানী সশক্ত বুন্দেলাখণ্ড রাজ্য। রাজা বুন্দেলা বীর ছত্রসাল যখন মারাঠা বাহিনীর অধীনে লড়াই করতে চেয়েছিলেন, তখন শিবাজী মহারাজ ছত্রসালকে বলেছিলেন, 'হে স্বাভিমানী বীর, তুমি কি চাকরি করবে? ক্ষত্রিয় কুলে জন্মে অন্য রাজার দাসত্বগিরি করবে কি? যাও গিয়ে নিজের রাজ্য স্থাপনা করো।'

বলেননি, 'আমার রাজ্যের সঙ্গে তোমার রাজ্য জুড়ে দাও'। ছত্রসাল সেই নির্দেশ মান্য করেছিলেন। তাঁর রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল যমুনা থেকে নর্মদা আর চম্বল থেকে টোঁস পর্যন্ত। অসমের রাজা 'চক্রধ্বজ সিংহ' মারাঠা সূর্য শিবাজীর রণনীতি অনুসরণ করে বিজয়ী হয়েছিলেন মোগল সৈন্যের বিরুদ্ধে। ব্রহ্মপুত্রের পাড় থেকে ইসলামি শত্রুসেনাকে বারংবার ফিরে যেতে হয়েছিল, অসমের মাটিতে মুঘলরা কোনোদিনই বা পাখতে পারেনি। অসম কোনোদিনই ইসলামের গোলাম হয়নি।

একইভাবে কোচবিহারের রাজা 'মহারাজা রুদ্রসিংহ' লড়েছিলেন। রণঘোষ দিয়েছিলেন, 'চলো বিধর্মীদের ডুবিয়ে দিয়ে আসি বঙ্গোপসাগরে'। শিবাজীর রাজ্যাভিষেক সেদিন সমগ্র ভারতের জন্য ছিল এক অমোঘ ধর্ম— রাজনীতির দিশানির্দেশ। ওড়াও গৈরিক বিজয়কেতন, ভারতময় প্রতিষ্ঠা করো 'হিন্দবি স্বারাজ্য'। যেদিন ইসলামি অত্যাচরে পর্যুদস্ত সুবে বাঙ্গলার মানুষের কাতর ত্রাহিরব শিবাজীর প্রবল অনুরাগী মারাঠা সেনাবাহিনীর কানে পৌঁছয়, তারা ভারতের সুদূর পশ্চিম থেকে জঙ্গলাকীর্ণ বিপদসংকুল পথের ব্যক্তিগত কষ্ট উপেক্ষা করে বারেবারে বাঙ্গলার মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ইসলামি

অত্যাচারের হাতে পীড়িত বাঙ্গলার ছায়াসুনিবীড় শান্ত গ্রামের মানুষের জীবন, বুক ভরা মধু বঙ্গের বধূদের কুল সম্ভ্রম রক্ষা করতে। কিন্তু কুচক্রী নারীলোভী ইসলামি শাসকরা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য প্রবল পরাক্রমী সেই হিন্দুসেনার আগমনকে 'বর্গি আক্রমণ' নামে অপপ্রচার করে দুর্নাম ছড়ায়। বর্গি আক্রমণের সুতীব্র আঘাতে ছিন্নভিন্ন ম্লেচ্ছ শাসকবর্গ মারাঠা সৈন্যের বিরুদ্ধে এই কারণে দুষ্প্রচারের আড়াল নেয়, যাতে বাঙ্গলার জনমানসে তাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলে স্থানীয় মানুষের সাহায্য থেকে মারাঠা বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায় (এই পশ্চিমবঙ্গেই হুগলী জেলায় মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের প্রচলিত মা ভবানী রূপের শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা আজও স্বমহিমায় অর্চিত)। পরবর্তীকালে ইংরেজ ও ভারতের দেশি শাসকরাও সেই অপপ্রচারকেই রাজনৈতিক কারণে বজায় রেখে চলেছে যাতে করে ভারতবর্ষের দুই দূরবর্তী প্রান্তের মানুষ কোনোদিন একাঙ্গীভূত, হিন্দু রাষ্ট্রাঙ্গভূত বোধ না করতে পারেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য শিবাবতার স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ এই শিবাজীর আদর্শকে সম্মুখে রেখেই 'হিন্দু রক্ষীবাহিনী' ও 'হিন্দু মিলন মন্দির' গড়ে তুলেছিলেন। 'বর্গির কুখ্যাতি' যদি এতোটুকু সত্যি হতো, তাহলে পরম রাষ্ট্রহিতৈষী, জনসেবার আকর ভারতের মহান তীর্থসংস্কারী সন্ন্যাসী স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ কখনোই হিন্দুকুলতিলক বীর শিবাজীর মত ও পথ সম্পর্কে এমন উচ্চ ধারণা প্রকাশ করতেন না।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৪ সালে এই কলকাতার বুকেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, লোকমান্য তিলকের উপস্থিতিতে 'শিবাজী উৎসব' পালন করেছিলেন, পাঠ করেছিলেন স্বরচিত 'শিবাজী উৎসব' কবিতা। সেই উৎসবে 'মা ভবানী'-র পূজা হয়েছিল। বাঙ্গলা তথা সমগ্র পরাধীন ভারতের আগুনখেকো বিপ্লবীদের অন্যতম প্রধান প্রেরণাস্রোত ছিলেন বীর শিবাজী।

ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তি লাভের জন্য শিবাজী কোনোদিনই অন্যান্য রাজ্যের শাসনব্যবস্থ নিজের হাতে তুলে নেননি, তাঁর স্বভাবই ছিল না এমন। লিসবনের পর্তুগিজ আর্কাইভে গোয়ার এক গভর্নরের চিঠি সংরক্ষিত আছে। সেই গভর্নরের আত্মীয় 'রাওজী সোমনাথ পতকী' শিবাজী মহারাজের এক কেল্লাদার ছিলেন। গভর্নর তার কাছে অনুযোগ করেছিলেন, 'তোমাদের শিবাজী সবসময় এতো অশান্তি, এতো লড়াই কেন করতে থাকে? সুখে শান্তিতে থাকতে পারে না?"

'পতকী' সেই প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছিলেন শিবাজীর কাছে,—'মহারাজ, এই যে এতো লড়াই লড়ে বহু দূরদূরান্তে 'স্বারাজ্য' ছড়িয়েছি আমরা, আপনার নিজস্ব পুনের জায়গির তো অনেক ছোটো, তা সত্ত্বেও আজ আপনার বিশাল রাজ্যবিস্তার হয়ে গেছে। এই বিশাল অঞ্চল নিয়ে কী করবেন মহারাজ? আর কতো বেশি স্বরাজ্য ছড়াতে চান আপনি?'

বীর শিবাজী বলেছিলেন— 'শোনো হে, সিন্ধু নদের উদ্গম থেকে কাবেরী নদীর দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত, এই হলো আমাদের অঞ্চল। এখান থেকে সমস্ত বিধর্মী আততায়ীদের, দেবদেউল ধ্বংসকারীদের তাড়িয়ে দিতে হবে, যেখানে যত তীর্থস্থান অপবিত্র বিধ্বংস করেছে তারা, সেই সব মন্দির, তীর্থক্ষেত্র আমাদের আবার গড়ে তুলতে হবে, সেই কারণেই আমাদের এই উদ্যম।' —শিবাজী মহারাজের সেই উত্তর গভর্নরের চিঠি হয়ে আজও সংরক্ষিত রয়েছে পর্তুগিজ আর্কাইভে। এমনই সুদূরপ্রসারী ছিল শিবাজীর দৃষ্টি;— হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি, সমাজের সংরক্ষণের মাধ্যমে হিন্দুরাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, ভারতবর্ষে 'হিন্দবি স্বরাজ্যে'র পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এই ছিল তাঁর দৃষ্টি। আপন কীর্তি স্থাপনের জন্য তিনি লালায়িত ছিলেন না। গুরু সমর্থ রামদাসের কৃপায় তাঁর দৃষ্টিতে পরম বৈভবশালী হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর কাছে ধর্মরক্ষা, সনাতন জীবনচর্যা।

আফজল খাঁ যখন আক্রমণ করেছিল, খোলা ময়দানে শিবাজীর ধুরন্ধর রণনীতির সঙ্গে এঁটে ওঠা অসম্ভব জেনে, প্রতাপগড়ে ঘাঁটি গাড়লো। তুলজা ভবানী মন্দির', 'পণ্ডারপুর মন্দির' অপবিত্র করে দিল, জ্বালিয়ে দিল গ্রামের পর গ্রাম, নষ্ট করে দিল ক্ষেতের ফসল, তাড়িয়ে দিল মানুষজন। ব্যাপক হারে গোহত্যা, নারীর চরম অপমান, অত্যাচার, উপদ্রব শুরু করে দিল (আজও ম্লেচ্ছধর্মের অনুযায়ীরা ঠিক সেইভাবেই সাধারণ মানুষের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে, আর হিন্দু সমাজ অসহায়ের মতো হাতে হাত ধরে রাজনৈতিক দলের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে)।

আজকের মতোই, সেদিনও দেশের লোকেরা অমনি শিবাজীর দুর্নাম শুরু করে দিয়েছিল। —'কোথায় গেল শিবাজী? কোথায় গেল তার বড়ো বড়ো বুলি? কোথায় লুকলো গিয়ে সেই পাহাড়ি ইঁদুর?'

শিবাজী এতো দুর্নাম, অপমানের মধ্যেও শুধু শান্ত ছিলেন তাই নয়, উলটে আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার মতো চতুর্দিকে আরও চাউর করে দিলেন, শিবাজী এবার সত্যিই খুব ভয় পেয়ে গেছেন। এমনই ছিল তাঁর কূটনীতি। নিজের সুনামের আকাঙ্ক্ষায় শিবাজী কোনোদিনই কিছু করেননি। তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল অতুলনীয়। লোকে বলে দেশের জন্য প্রাণ বলিদান দেব। কিন্তু পরাক্রমী শিবাজীর বিজিগীষু মন চেয়েছিল দেশের জন্য লড়তে, শত্রুদের নিকেশ করে নিষ্কণ্টক বিজয়প্রাপ্তি করতে। মাত্র পঞ্চাশ বছরের জীবনকালে তাই তিনি আজীবন অখণ্ড পরিশ্রম করে গেছেন। নিজেকে সুরক্ষিত রেখে অন্যকে লড়াইয়ের ময়দানে এগিয়ে না দিয়ে, নিজেই সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতেন।

আফজল খাঁ প্রতাপগড়ে আসার পরও সব দুর্নাম সহ্য করে শিবাজী শান্ত হয়ে প্রস্তুতি নিয়েছেন, প্রতীক্ষায় থেকেছেন উপযুক্ত সময়ের। আফজল খাঁ-র শিবিরে

প্রবেশ করার পরও ধৈর্য ধরে সমস্ত অপমান স্বীকার করে নিয়েছেন। আর যেইমাত্র উচিত প্রসঙ্গ উঠেছে, সুযোগ পেয়েছেন, সেই প্রথম সুযোগেই আফজল খাঁ-কে সমূলে বিনষ্ট করে দিয়েছেন। আর একই সঙ্গে সময় নষ্ট না করে মাত্র চার মাস এমন রণোদ্যম করলেন, যে 'গোলকোণ্ডা-বীজাপুরে'-র সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি পেল তাঁর 'হিন্দবি স্বরাজ্যে'র সীমানা। কখনো সাহস করতে হবে, কখনো ধৈর্য ধরতে হবে, কখন শান্ত হয়ে থাকতে হবে, আর কখনই-বা অতর্কিতে আক্রমণ করে শত্রুকে সমূলে বিনষ্ট করে দিতে হবে, সেই বিষয়ে তাঁর বিশেষ বিবেক বুদ্ধি ছিল অতুলনীয়। আমরা, ভারতীয়রা ধর্ম মেনে, ন্যায়-নীতি বিচার করে ধর্মযুদ্ধ করতাম। শত্রুসেনাকে হুঁশিয়ার না করে, অতর্কিতে অন্যায় আক্রমণ করতাম না। শিবাজী মহারাজ যুদ্ধনীতির সেই পরিভাষাই বদলে দিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন যেখানে যে ভেদনীতি প্রয়োজন তার প্রয়োগ করে বিজয়ী করেছিলেন পাণ্ডবদের, শিবাজীও সেই একই 'শঠে শাঠ্যাং সমাচরেৎ' মন্ত্রে অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। শত্রু যদি ছল-কপটের আশ্রয় নেয়, তার সঙ্গে সেই ভাষাতেই কথা বলতে হবে। ধর্ম স্থাপনার জন্য, কূটনীতিই ন্যায্য নীতি। নীতিহীন শত্রুর সঙ্গে নীতিজ্ঞ হয়ে যুদ্ধ করা চলে না, তার সঙ্গে নীতিহীনতাই সঠিক যুদ্ধনীতি। তৎকালীন ভারতবর্ষে শিবাজীই ছিলেন প্রথম রণনায়ক, যিনি একই সঙ্গে নৌবহর, অশ্বারোহী বাহিনী আর পদাতিক সেনাবাহিনীর ব্যূহ রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

বর্তমানের মাটিতে দাঁড়িয়ে আমাদের মহান শিবাজীর বিজিগীষু চরিত্রের গুণগুলি আত্মস্থ করতে হবে। সমাজের সামূহিক শক্তিকে সংগঠিত করেই পরম বৈভবশালী হিন্দুরাষ্ট্র গঠনে উদ্যমী হতে হবে। হতোদ্যম বিগতস্পৃহ সমাজের মধ্যে সদাচারের গুণবত্তা, উদ্যম আর আত্মবিশ্বাস নির্মাণ করকে হবে। সনাতন হিন্দু সমাজের পরম ধন হলো শাশ্বত ভগবৎ তত্ত্ব আর গৈরিক ধ্বজ। কিন্তু সাধারণ মানুষ নির্গুণ নিরাকারকে সহজে বুঝতে পারেন না। তাঁদের সম্মুখে সগুণ সাকার স্বরূপ চাই, তাই ভক্তের মানসিকতা অনুযায়ী মূর্তি রূপে নির্গুণ ব্রহ্ম সাকার হয়ে আসেন, যাতে মানুষ সহজে পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হতে পারে। তাই, রাম রূপ, কৃষ্ণ রূপ, তাই জীবন্ত ব্যক্তিস্বরূপ আদর্শ হিসাবে শিবাজী মহারাজের জীবন দর্শন।

তাঁর সেই মহান স্বরূপের, সেই নিষ্কলুষ চরিত্রের, সেই রাজ ও রণ নীতির, সেই কর্মকুশলতার আর সেই উদ্দেশ্যের পবিত্রতা আজ একান্ত প্রয়োজন। তাঁর চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা হৃদয়ঙ্গম করেই ভারতীয় হিন্দু সমাজ, জ্যৈষ্ঠ-শুক্ল ত্রয়োদশীতে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকের দিনটিকে হিন্দুসাম্রাজ্য দিনোৎসব হিসেবে পালন করেন। জয়তু শিবাজী।

(হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

অষ্টাদশ শতকের এক ব্রিটিশ সন্তান জগতের কাছে ভারতের হিন্দু সভ্যতার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পরিচয় করিয়েছিলেন

দেবাশিস লাহা

জাদুঘর দেখতে গিয়ে পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রাহকারক কর্নেল Colin Machenzie নামটা দেখার পর বিদ্যুত চমকের মতো একটি নাম মনে পড়ে গেল—জেনারেল চার্লস স্টুয়ার্ট।

আজ থেকে ২০০ বছর পিছনের উড স্ট্রিট। কোনও এক বাড়ি থেকে কলকাতার রাজপথে প্রকাশ্যে গামছা কাঁধে শুদ্ধ সংস্কৃতে স্তব করতে করতে প্রতিদিন গঙ্গাস্নানে যান এক সাহেব। 'Quite a character'—মন্তব্য করেছেন তৎকালীন প্রধান সেনাপতির স্ত্রী লেডি ন্যুজেন্ট। 'An Idol-stealer' বা মূর্তি চোর বলেছেন জনৈক মিশনারি। যদিও মিশনারিরা তাঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন মূর্তি-চোর বলে, তবে Epigraphia Indica-তে ডঃ এল ডি বারনেট লিখেছেন, ''ভারতীয় হিন্দু রীতিপদ্ধতি এবং মূর্তি ইত্যাদির প্রতি তীব্র আকর্ষণ এবং পুরাতাত্ত্বিক বস্তু সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁর অনৈতিক পদ্ধতি গ্রহণ, তাঁর এই বদনামের কারণ।''

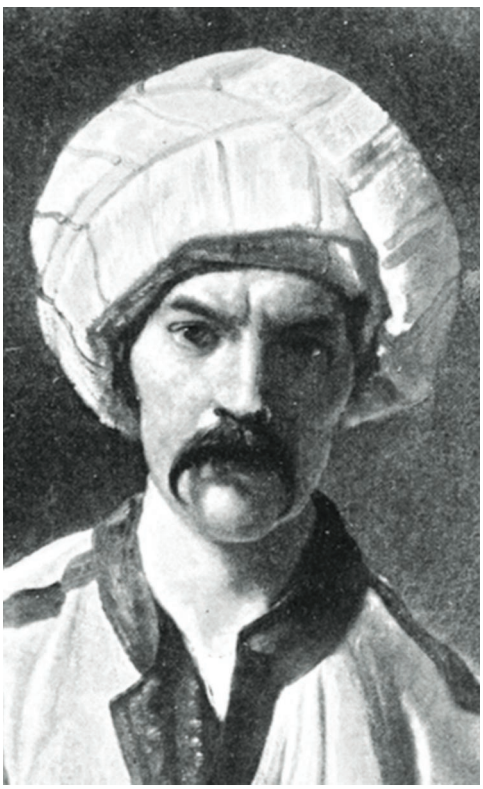

যারা তুলনামূলকভাবে ভদ্র, তাঁরা বললেন 'চোর ঠিক নয়'। বরঞ্চ মাথায় কিঞ্চিৎ সমস্যা ছিল। স্যার ইভান কটন তো বলেই বসলেন, ''Prolonged residence in India sometimes resulted in eccentricity.'' মানে ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন থাকলে মাথার সমস্যা দেখা দেয়। অর্থাৎ মিশনারিদের চোখে স্টুয়ার্ট মূর্তি চোর আর ইভান কটনের মতে উন্মাদ।

কিন্তু প্রশ্ন হল, ভারতবর্ষে এত লোভনীয় বস্তু থাকতে স্টুয়ার্ট সাহেব পাথরের মূর্তি কিংবা তালপাতার পুঁথিকেই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে নিলেন কেন? পয়সার জন্য তো নয়। তিনি তো সব দান করেছিলেন।

স্টায়ার্ট সাহেব ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব করেছেন দীর্ঘকাল। তারপর সাগর থেকে ওড়িশার ব্রহ্মপুর হয়ে কলকাতায়। সাগরে থাকাকালীন এক হিন্দু রমণীকে বিয়ে করে নিজ অর্থেই একটি মন্দির গড়েন। ওড়িশায় থাকতেই তিনি নিয়মিত মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিতেন। এরপর চলে এলেন সস্ত্রীক কলকাতায়। এখানে রোজ পায়ে হেঁটে গঙ্গাস্নানে যেতেন, পুজো দিতেন।

এরপর বাড়ি এসে ঢুকতেন তাঁর মিউজিয়মে। মিউজিয়াম মানে স্টুয়ার্ট এর গোটা বাড়িটাই তখন মিউজিয়াম। ভারতীয় ছবি, মূর্তি, পুঁথিপত্র, ঢাল-তরোয়াল, পোশাক-অলংকার সব কিছুই আছে সেখানে। কৌতুহলী দর্শকদের স্টুয়ার্ট সাহেব নিজে ঘুরিয়ে দেখাতেন সব।

শুধু মিউজিয়াম গড়লেই তো লোকে উন্মাদ হয় না। সংস্কৃত বললেও না। তা হলে জোন্স, উইলসন সাহেবদেরও পাগল বলত সাধারণ ইংরেজরা। আসলে স্টুয়ার্ট-এর উন্মাদ অপবাদের ছিল অন্য কারণ। স্টুয়ার্ট ছিলেন হিন্দু, কেবল গঙ্গাস্নান বা মন্দিরে পুজো দিতেন বলে নয় বা হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছিলেন বলে নয়। স্টুয়ার্ট-এর অপরাধ ছিল যে তিনি বাস্তবিকই হিন্দু হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এমন উৎসাহভরে এ দেশের ভাষা, রীতিনীতি চর্চা করেছিলেন এবং হিন্দুধর্মের প্রতি এমন সহানুভূতিশীল ছিলেন যে সবাই তাঁকে বলত হিন্দু স্টুয়ার্ট।

স্বজাতির ব্যঙ্গ এবং নেটিভদের ভালোবাসার মধ্যে বৃদ্ধ স্টুয়ার্ট চলে গেলেন ৩১শে মার্চ, ১৮২৮। ঘটনাচক্রে এমন হল যে শুধু ভারত নয়, ইংল্যাণ্ডও ভুলতে পারল না তাঁকে। কারণ ইংল্যান্ডের সংস্কৃত ভান্ডারে স্টুয়ার্ট রেখে গিয়েছেন একরাশ অমূল্য সম্পদ। এই খবরটিও জানিয়েছিলেন একজন ভারতীয়—রমাপ্রসাদ চন্দ। ১৯৩৪ সালে রমাপ্রসাদ বাবু লন্ডনে গিয়েছিলেন Anthropological Congress এ যোগদান করতে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ভাস্কর্য ঘাঁটতে গিয়ে তিনি পুনরাবিস্কার করলেন স্টুয়ার্ট সাহেবকে।

যদিও সংগ্রহটি পরিচিত ছিল 'ব্রিজ কালেকশন' নামে, কিন্তু catalogue ঘাঁটতে গিয়ে দেখা যায় যে এর মালিক আদপেই T. W. Bridge নয়, আসলে জেনারেল স্টুয়ার্ট। ১৮৩০ সালে নিলামে বিক্রি হয়েছিল এগুলো। বহরমপুরে (১৮২৩) থাকার সময়ই স্টুয়ার্ট এই সংগ্রহটির উল্লেখ করে গিয়েছেন তাঁর উইলে। তিনি উইলে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর পুরাতত্ত্বের সংগ্রহটি যেন ৩০,০০০ টাকা ইনসিওর করে লন্ডনে পাঠানো হয়। তা ছাড়া আরও লিখেছিলেন যে লন্ডনের বন্ড স্ট্রিটের মিঃ জন নামে এক পুস্তক-বিক্রেতার কাছে ওনার বিরাট পুঁথির এবং ভারতীয় পুরাবস্তুর সংগ্রহ রয়েছে। সেগুলো যেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দান করা হয়।

পুঁথিগুলোর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। মিঃ ব্রিজ কিনেছিলেন ভাস্কর্য নিদর্শনগুলো। ১৮৭২ সালে ব্রিজের কন্যারা আবার নিলামে তুলেছিলেন এই সংগ্রহ। খরিদ্দারের অভাবে মেয়েরা পিতার নামে দান করে দিলেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। তার নাম 'ব্রিজ কালেকশন' যা আদপে General স্টুয়ার্ট-এর সংগ্রহ। জেনারেল স্টুয়ার্ট-এর অধিকাংশ সংগ্রহ করেছিলেন অর্থ, চাতুর্য, শক্তি সমস্ত কিছুর বিনিময়ে। কিন্তু কেন?

South Park Street Cemetery তে স্টুয়ার্ট-এর সমাধি মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল হিন্দু মন্দিরের গড়নে। তাতে হিন্দু দেবদেবী, পৃথ্বীদেবী, মকরবাহিনী গঙ্গার অলংকরণ। জীবনের পরম সত্যটাকে মৃত্যুর পরেও যাতে কেউ মিথ্যে না করে দিতে পারে, বিশেষত মিশনারিরা, তার জন্যই স্টুয়ার্ট-এর এই প্রচেষ্টা। যে চোর চুরি করা দ্রব্যও এমন সদম্ভে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যেতে পারেন, তিনি তো চোর নন।

আসলে স্টুয়ার্ট সাহেব তাঁর সমগ্র জীবন দিয়ে ভারতবর্ষ আর হিন্দুধর্মকে পরিচিত করাতে চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে। স্টুয়ার্ট লিখছেন, "I allude to those children of the East, the Hindus, a people whose religio-philosophy and wisdom are everyday being more and more revived. Looking back to the earliest days of the history of the known world, we find that the first linguistic records belong to the people under consideration, and date back to that far-distance cycle known as Aryan civilization. Beyond history we cannot go; but the sculptures, monuments and cave temples of India, all point to a time so far beyond the scant history at our disposal, that in the examination of such matters our (Western Civilization) greatest knowledge is dwarfed into infinite nothingness–our age and era are but the swaddling clothes of the child; our manhood that of the infant in the arms of the eternity of MAHAKAL"।

অষ্টাদশ শতকের ব্রিটিশ সন্তান জেনারেল চার্লস স্টুয়ার্ট ভারতীয় হিন্দু সভ্যতাকে জগতের কাছে তুলে ধরার জন্য যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে তাঁকে 'মহান' বললেও বোধহয় কম বলা হয়। □

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

নাগরিক জীবনে নীরবে বৈপ্লবিক উন্নয়ন

শেখর সেনগুপ্ত

বসতবাটি নির্মাণ করতে হলে যে সমস্ত ধাপ আপনাকে পার হতে হবে, পাঁচজনের কাছে খোঁজখবর নিলেই আপনি তাদের হদিশ পেয়ে যাবেন। আপনার ব্যাকুলতা যতই থাকে, অনেক অনেকের নিকট বিষয়টা যেন খেলনা নিয়ে খেলা। আপনি তাই সার্বিক আলোচনায় না গিয়ে কেবল এই ব্যাপারের একটা প্রায় নতুন সংস্কারের আলোচনায় যেতে চাই— যেটা আজও অনেকের নিকট যেন একটি দূরের গ্রহ। বিশেষত সাংসারিক কর্মপরিধিতে যিনি মোটামুটি একলা, হরেক কিসিমের দায় সামলাতে সময় সময় প্রায় জ্বলেপুড়ে খাক, তিনি এই অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটিও সানন্দে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। আমি বলছি, নির্মিয়মান গৃহ নির্মাণের জন্য অনলাইনে অনুমতি আনা বাড়িতে বসে বসেই। বিষয়টি পোশাকি পরিচিতি এই রকম—

On line Building Permission—OBPS.

এই ব্যবস্থাটি প্রথম প্রবর্তিত হয় ২০১৬ সনের এপ্রিল মাসে দিল্লি এবং মুম্বাইতে। বর্তমানে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে ভারতের অধিকাংশ শহরে,— যাদের সংখ্যা এখন ২০২৩টি। এমনকী আন্দামান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পুরসভাগুলিতেও এই অনলাইন ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। কৃতিত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। ভারতের শহরাঞ্চলে পুরসভাগুলি যাতে রাস্তাঘাটে অপেক্ষাকৃত কম খরচে আলোর ব্যবস্থা করতে পারে, এই বিষয়ে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিকল্পনাটি করেছিলেন সেটা কিন্তু ফাঁকা আওয়াজে পরিণত হয়নি। ভারতের বিভিন্ন পুরএলাকায় এ অবধি এক কোটি সাড়ে তিন লক্ষ প্রচলিত বাতি বদল করে বসানো হয়েছে জ্বালানি সাশ্রয়ী এলইডি লাইট। এতে বছরে বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয় কমেছে প্রায় দু'শো কোটি কিলোওয়াট এবং কার্বন নির্গমন

কমেছে বছরে ১৯ লক্ষ টন। জল আমাদের জাতীয় সমস্যার অন্যতম। এই সমস্যার সমাধানে ২০১৯ সনের ১ জুলাই কেন্দ্রের জলশক্তি মন্ত্রক বৃহৎ উদ্যমে কাজ শুরু করে। সেই উদ্যমের মুখ্য লক্ষ্য ছিল এই গুলি :

(১) জল সংরক্ষণ।

(২) জল শোধন।

(৩) জলাশয়গুলিতে জলের স্তর বৃদ্ধি।

(৪) ভূগর্ভে জলের স্তর বৃদ্ধি।

(৫) বর্জ্য জলের পুনর্ব্যবহার।

(৬) দেশের ৭৫৪টি জলাভাবে আক্রান্ত শহরের মানুষকে জল সংরক্ষণের জন্য আরও সচেতন করে তোলা প্রচার ও আন্দোলনের মাধ্যমে।

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার বিগত পাঁচ বছরে উক্ত ছয় দফা কর্মকাণ্ডে প্রায় নীরবে যে পরিমাণ সাফল্য অর্জন করেছেন, তাকে আমি বৈপ্লবিক আখ্যা দিতে দ্বিধাগ্রস্ত নই। এই মুহূর্তে উন্নয়নের সেই অগ্রগতির কিছুটা আঁচ পাঠক পাবেন নিম্নোক্ত তথ্য থেকে :

(ক) প্রতিদিন বর্জ্যজলকে শোধন করে চলেছে ৪০.১১৯টি সংস্থা।

(খ) নতুন রেলওয়াটার হারভেস্টিং স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে দেশে ৫৫ হাজার ৩৪৪টি।

(গ) ২১৭৬টি জলাশয় সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে।

(ঘ) সরকারি উদ্যোগে বৃক্ষ রোপণের সংখ্যা ৮ লক্ষ ৩১ হাজার।

(ঙ) ৫০০টি শহরে ৬২ শতাংশের বেশি বসতবাটিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(চ) ওই ৫০০টি শহরের ৬২ শতাংশের বেশি নিবাসে উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে পয়ঃপ্রণালী এবং সেপটিক ট্যাঙ্কের।

এই সমস্ত উন্নয়নকে নিয়ে প্রচার কম। বরং তাদের অসারত্ব প্রমাণে বিরোধীদের প্রয়াস দিব্যি টের পাওয়া যায়। আমাদের আকুতি থাকা উচিত সত্যের সন্ধানী থাকার জন্য। মিথ্যা প্রচার তখনই বৃদ্ধি পায়, যখন রাজনৈতিক স্বার্থে নাচানাচি বাড়ে। এই করোনাক্রান্তকালে স্বস্তির নিঃশ্বাস যখন নেই, তখনও প্রত্যেক নাগরিকের উচিত সঠিক তথ্যের প্রতি অতিশয় বিশ্বস্ত থাকা। এতে মানুষের মান বাড়ে, কমে না।

তথ্যসূত্র :

1. Economic Survey of India 2019-20. Volume-II.

2. Urbanization, demographic transition and growth of Cities in India 1870–2020. —International Groeth Centre C–35205 INC-I, 2019.

3. Structural developments of our Cities in recent times– Mr. Durga Shankar Mishra.—

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
21 June - 2021 - Rs. 12.00
Postal Registration No. KOL RMS/048/2019-2021

Dil main
INDIA

Let's
illuminate
the nation
with
Make in India

SURYA

MADE IN INDIA
LIGHTING | APPLIANCES
FANS | STEEL & PVC PIPES

AATMA NIRBHAR BHARAT KI PEHCHAN

SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@surya.in | www.surya.co.in | suryalighting surya_roshni
Tel: +91-11-47108000, 25810093-96 | Toll Free No.: 1800 102 5657

SWASTIKA DIGITAL SWASTIKA DIGITAL swastikadigitalindia@gmail.com
Contact us Chandrachur Goswami :9674585214 Anamika Dey : 9903963088

Published and Printed by Sarada Prasad Paul on behalf of OmSwastik Prakashan Private Limited at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6. Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Rantidev Sengupta. ।। দাম ১২ টাকা ।।